বাংলার ভেড়া গাড়োল

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসা

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি, মুর্শিদাবাদ

ডাঃ অর্কপ্রভ শী
ডঃ সুজন বিশ্বাস
ডঃ সলিল গুপ্ত
আফসানা মণ্ডল

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Dr. Arkaprabha Shee, Dr. Salil Kumar Gupta,
Dr. Sujan Biswas, Afsana Mondal 2025

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

BlueRose ONE.com
Stories Matter
NewDelhi • London

For permissions requests or inquiries regarding this publication,
please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-7542-492-5

Cover Design: Shubham Verma
Typesetting: Sagar

First Edition: December 2025

মুখবন্ধ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য শিষ্য, স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ এবং "জীবসেবাই শিবসেবা" এই মহাব্রতের জীবন্ত প্রতিমূর্তি স্বামী অখন্ডানন্দ মহারাজ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ ভ্রমণকালে যে সেবার ধারা সূচনা করেছিলেন, আজও সেই ধারা অক্ষুন্নভাবে বয়ে চলেছে। ভাগীরথীর তীরবর্তী প্রত্যন্ত গ্রাম মহুলায় তিনি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যে উদ্ধার কার্য শুরু করেছিলেন, তারই চূড়ান্ত বিকাশস্বরূপ সারগাছিতে প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম শাখাকেন্দ্র। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির মূলে কৃষকের উন্নয়নকেই তিনি মানবোন্নয়নের প্রধান পথ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ব্রত আজ শতাধিক বছর পরেও আমাদের আশ্রমকে আলোকিত করছে।

সময়ের পরিক্রমায় ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, শিল্প ও কৃষি বিপ্লবের অগ্রযাত্রায় বিশ্বের দরবারে এক মহিমান্বিত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে দেশের প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে গ্রামীণ সমাজের উন্নতিতে। তাই সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নিরন্তর চেষ্টা করছে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, কৃষি ও স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শক্তিশালী করে তুলতে। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, তন্তুজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রশিক্ষণ, গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ কিংবা আধুনিক কৃষি গবেষণা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছি। বিশেষত, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত ধান্যগঙ্গা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে।

কৃষির সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই পশুপালন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মুর্শিদাবাদের জলবায়ু ও প্রেক্ষাপটে গাড়োল জাতীয় ভেড়া পালন আজ একটি লাভজনক ও টেকসই পেশা হিসেবে প্রতিভাত। এই পশুপালনকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে এই গ্রন্থের সংকলন। আমাদের আশা, এই বই গ্রামীণ যুবক-যুবতী, কৃষক ও পশুপালনপ্রেমীদের কাছে এক অমূল্য দিশারি হয়ে উঠবে।

যদি এই প্রয়াসের মাধ্যমে মানুষের জীবন-জীবিকায় সামান্যতমও সমৃদ্ধি আসে, তবে এই প্রচেষ্টা সত্যিই মহত্ব লাভ করবে। স্বামী অখন্ডানন্দ মহারাজের শাশ্বত আদর্শকে সামনে রেখে, আমরা ভবিষ্যতেও মানুষের সেবায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

স্বামী বিশ্বময়ানন্দ, অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

লেখকেরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বমায়ানন্দ মহারাজের নিকট, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি। প্রানীসম্পদে গাড়োল ভেড়ার যে এতখানি গুরুত্ব আছে, সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেটা উনি ব্যাপকভাবে অনুভব করেন এবং এই বইটি লেখার ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন। প্রতিপদে উনি সময়োপযোগী অত্যন্ত সুচিন্তিত সুপরামর্শ দিয়েছেন, যেটা ভীষণ রকমভাবে উপকারে লেগেছে এবং যেটা ব্যাতীত এই বইটি লেখা সম্ভব হত না।

লেখকেরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ডাঃ সুভাষ বোস (প্রাক্তন-অধিকর্তা, প্রানীসম্পদ বিকাশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ও ডাঃ অরিন্দম সামন্ত (প্রাণী চিকিৎসক, প্রানীসম্পদ বিকাশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) মহাশয় দ্বয়ের নিকট। প্রানীসম্পদ দপ্তরে দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গাড়োল ভেড়া প্রতিপালন ও চিকিৎসার ব্যাপারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন যার ওপর ভিত্তি করে বইটি লেখা অনেক সহজ হয়েছে।

লেখকরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকবে ধান্যগঙ্গা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ও সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রতিটি সেবাকর্মীর নিকট, যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া বইটি লেখা অসম্ভব ছিল।

প্রত্যেক লেখকের প্রতিটি পরিবারবর্গের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা, প্রত্যেক লেখকই আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণে রাখবেন।

এই বইটি লেখার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে প্রচুর তথ্য এবং বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি তাই সর্বত ভাবে সেগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করা হল।

বইটির প্রকাশনা, মুদ্রন ইত্যাদি বিষয়ে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাদের জন্য রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পুনশ্চঃ অসাবধানবশত বইটির মুদ্রণে বা শ্রেনীবিন্যাসে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকলে সংশোধনে এবং বিজ্ঞানসম্মত, গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রস্তবনা সাদরে গৃহীত হবে, এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	**ভূমিকা- গাড়োল ভেড়ার পরিচয়** গাড়োল ভেড়ার উৎস; গাড়োল ভেড়ার বৈচিত্র্য; ভেড়ার রূপগত বৈশিষ্ট্য; গাড়োল ভেড়া পালনের উপযোগিতা	**01-09**
অধ্যায়-২	**ভেড়ার বিভিন্ন প্রজাতি** নাতিশীতোষ্ণ উত্তরাঞ্চলের ভেড়া; শুষ্ক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভেড়া; দক্ষিণাঞ্চলের ভেড়া; পূর্বাঞ্চলে ভেড়ার প্রজাতি; প্রজাতিগত শ্রেণীবিভাগ; গাড়োল, বনপালা ও ছোটনাগপুরি	**10-20**
অধ্যায়-৩	**গাড়োল ভেড়ার বাসস্থান** গাড়োল ভেড়া পালনের আদর্শ ঘর; গাড়োল ভেড়ার ঘরের পরিমাপ	**21-24**
অধ্যায়-৪	**গাড়োল ভেড়ার খাবার** ভেড়ার খাদ্যে সংযোজিত উপাদান; গাড়োল বাচ্চার খাবার; ভেড়ার বাচ্চাদের জন্য ক্রীপ ফিডিং; বাড়ন্ত গাড়োল ভেড়ার খাবার; গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাড়োল ভেড়ার খাবার; বাড়িতেই দানা বা সুষম খাবার তৈরীর পদ্ধতি; প্রজননক্ষম পাঁঠার খাবার; গাড়োল ভেড়ার দানাখাবারের মিশ্রন (শতকরা); কিছু প্রচলিত সবুজ ঘাসের চাষ; সহজলভ্য কিছু অপ্রচলিত পশুখাদ্য; পাঁচটি ভেড়া নিয়ে সারা বছরের সবুজ ঘাসের/খাদ্যের যোগান; বিভিন্ন ওজন ও বয়সের ভেড়াকে কি কি খাবার দিতে হবে; সবুজ-ঘাস চাষের বর্ষচক্র	**25-46**
অধ্যায়-৫	**গাড়োল ভেড়ার প্রজনন** গাড়োল ভেড়ার গরম হবার লক্ষন; গর্ভাবস্থার	**47-61**

	সতর্কতা; প্রসবের পূর্ব মুহূর্তের লক্ষন; প্রসবকালীন লক্ষন; প্রসবের সময় এবং সদ্যজাত বাচ্চার প্রতি করনীয়; মাতৃদুগ্ধ প্রতিস্থাপক (Milk Replacer); প্রজননের জন্য পুরুষ ভেড়া নির্বাচন; প্রজননের জন্য পুরুষ গাড়োল ভেড়ার পরিচর্যা; প্রজননের জন্য স্ত্রী ভেড়া নির্বাচন; সঠিক প্রজনন পন্থা অবলম্বন; গাড়োল ভেড়া প্রজনন ও পালন সম্পর্কীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কেন পাঁঠা পরিবর্তন করা দরকার; ভেড়ার বয়স নির্দ্ধারণ করার পদ্ধতি	
অধ্যায়-৬	**ভেড়া পালন পদ্ধতি** বাড়ীর চত্বরে পালন; স্বল্প খরচে বাসস্থান নির্মান; ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভেড়া পালন; ভেড়া পালনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য; ভেড়ার মল-মূত্রের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার; গাভীন ভেড়ার পরিচর্যা; জন্মের পর বাচ্চার পরিচর্যা; গাড়োল ভেড়া পালনের জন্য কিছু বিশেষ টোটকা; শীতকালে ভেড়ার বাচ্চার মৃত্যুহার কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	**62-73**
অধ্যায়-৭	**ঋতু বিশেষে কর্মসূচী** ভেড়াপালনে গ্রীষ্মকালীন কর্মসূচী; ভেড়াপালনে শীতকালীন কর্মসূচী	**74-79**
অধ্যায়-৮	**গাড়োল ভেড়ার রোগব্যাধি ও তার প্রতিকার** **ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার** আন্ত্রিক বিষক্রিয়া (এন্টারোটক্সিমিয়া); তরকা/আনথ্রাক্স; গলাফোলা; বাদলা (ব্ল্যাক কোয়ার্টার); ব্রুসেল্লোসিস; ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস; কোলিব্যাসিলোসিস বা আন্ত্রিক রোগ; গাড়োল ভেড়া ছানার পেটফাঁপা বা পেট ফোলা (টাইপ্যানিটিস); কন্টাজিয়াস ক্যাপ্রাইন প্লুরো নিউমোনিয়া (সি সি পিপি); ক্লোস্ট্রিডিয়াল ডিজিজ; পা-পচা রোগ; ক্যাসিয়াস লিম্ফ্যাডেনিটিস; লিস্টেরিওসিস; অ্যানাপ্লাজমোসিস; ম্যাস্টাইটিস; সংক্রামক নেক্রোটিক হেপাটাইটিস; ক্ল্যামাইডিওসিস; কিউ-জ্বর **ভাইরাস-ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার** গাড়োল ভেড়ার পি পি আর; গাড়োল ভেড়ার বসন্ত;	**80-127**

গাড়োল ভেড়ার ওরফ/ কনটাজিওয়াস একথাইমা (মুখে ঘা); এঁষো বা খুরাই; জলাতঙ্ক; মুখের ঘা; রিফট-ভ্যালি ফিভার; নীল জিহ্বা রোগ; স্ক্র্যাপি; পালমোনারি অ্যাডেনোমাটোসিস; মাইকোপ্লাজমোসিস

পরজীবি ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

বাহ্যিক পরজীবি ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

খোসপাঁচড়া বা কঞ্চ (মেনজ); সার্কোপ্টিক খোস-পাচড়া; সোরোপটিক খোস-পাচড়া; কোরিওপটিক খোস-পাচড়া; ভেড়ার মস্তিষ্কে ম্যাগট; ভেড়ার রক্ত শোষণকারী পরজীবী; ভেড়ার উকুন; উল ম্যাগট; চিউইং লাইস; ভেড়ার নাইরোবি রোগ

আভ্যন্তরীন পরজীবি ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

গোলাকার কৃমি; স্ট্রংগিলইডিয়াসিস; হিমনকোসিস; ফুসফুসের কৃমি; ফ্যাসিওলোসিস; একাইনোকোক্কোসিস; মনিজিয়াসিস; কোয়েনুরোসিস; স্টিলেসিয়া হেপাটিকা

প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

ককসিডিওসিস; থাইলেরিয়োসিস; বেবেসিওসিস

সাধারণ রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

নাভির প্রদাহ; অস্থিসংযোগস্থল প্রদাহ বা গেঁটেবাত (আর্থারাইটিস); নিউমোনিয়া; বৃক্কের পাথর মূত্রাশয়ের পাথর (ইউরিনারি ক্যালিকুলি); ভ্রূণমোচণ বা গর্ভপাত; গর্ভকালীন বিষক্রিয়া

ভিটামিনের অভাব জনিত রোগ

সাদা পেশীর রোগ; পোলিওএন্সেফালোম্যালেসিয়া; ল্যাকটিক অ্যাসিডিওসিস

গাড়োল ভেড়ার কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর সুচী

গাড়োল ভেড়ার টীকাকরন সুচী

জুনোটিক রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

অধ্যায়-৯	**বীমাকরন** বিমা কোম্পানীর নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা	**128-130**
অধ্যায়-১০	**বিপনন ও বাজারীকরন**	**131**
অধ্যায়-১১	**প্রশিক্ষণ** প্রাণীপালনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ঠিকানা;	**132-137**
অধ্যায়-১২	প্রাণীপালন সম্পর্কিত সরকারী খামার ও ঠিকানা	**138-141**
অধ্যায়-১৩	**স্বাস্থ্যসম্মত মাংস প্রক্রিয়াকরণ** বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাংস প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয়তা; মাংস প্রক্রিয়াকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি; মাংস বিক্রেতার করণীয় কর্তব্য; বিভিন্ন প্রজাতির মাংসের পুষ্টিগুণ	**142-146**
অধ্যায়-১৪	**বিভিন্ন সরকারী সহয়তা মূলক প্রকল্প** ন্যাশানাল লাইভস্টক মিশন; কিষান ক্রেডিট কার্ড (প্রানীপালন); প্রাণীজ শিল্প সম্বন্ধিত পরিকাঠামো গঠনের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগ সুবিধা; এন্টারপ্রেণিয়রশীপ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন; স্বামী বিবেকানন্দ স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প; ছাগল ও ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প; প্রধামন্ত্রী মুদ্রা যোজনা	**147-154**
অধ্যায়-১৫	**সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প** সামাজিক সুরক্ষা যোজনা; সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা (SSY); প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনা (PMJJBY); প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (PMSBY)	**155-157**
অধ্যায়-১৬	**References**	**158-164**

ভূমিকা

গাড়োল হল একটি ছোট আকারের ক্ষুদ্র প্রজাতির ভেড়া, যার শরীরের ওজন অন্যান্য জাতের ভেড়ার তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম, যাদের মাথা ছোট, মাঝারি আকারের কান এবং ছোট লেজ রয়েছে। পরিণত স্ত্রী ভেড়া এবং পুরুষ ভেড়ার গড় ওজন যথাক্রমে ১৪ কেজি এবং ১৬ কেজি হতে পারে। গাড়োল ভেড়া, ছাগলের সঙ্গে একসাথে পালন করা যেতে পারে। ভেড়ার এই জাতটির একসঙ্গে বহুসন্তান প্রসবের ক্ষমতা রয়েছে এবং এই ক্ষমতাটি বরোলা জিনের (FecB) মাধ্যমে হয়। গাড়োল ভেড়া প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র দক্ষিণ এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় এই ভেড়ার পালন পরিলিক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় গাড়োল ভেড়া ১৭-১৯ শতকে চীন (তিব্বত) থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয়।

চারণভূমিতে গাড়োল ভেড়া

গাড়োল ভেড়ার জাতটি পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণ, আর্দ্র এবং জলাভূমিপূর্ণ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে বিদ্যমান। এটি প্রধানত মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন গৃহস্থদের অর্থনৈতিক জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভেড়ার আঁটোসাঁটো (দৃঢ়) এবং বর্গাকার শরীর হয়। শরীরের রং প্রধানত ধূসর এবং সাদা হয়ে থাকে। পুরুষ ভেড়া শিংযুক্ত কিন্তু স্ত্রী ভেড়া শিংবিহীন হয়। লোম উন্মুক্ত, খুব মোটা এবং প্রায় পুরো শরীর ও পায়ের অধিকাংশ লোমে ঢাকা থাকে। এই ভেড়ার লোম সাধারণত ছাঁটা হয়না তবে কিছু ভেড়া পালনকারী ভেড়ার পশম ছেঁটে বিছানার উপাদান হিসেবে তা ব্যবহার করেন। ইংরাজিতে স্ত্রী ভেড়াকে বলা হয় Ewes, পুরুষদের বলা হয় Ram এবং বাচ্চাদের Lamb। গাড়োল সাধারণত সারা বছরই প্রজনন

করতে পারে তবে লক্ষ্য করা গেছে সর্বোচ্চ প্রজননের সময়- ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এবং আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাস।

ভারতে ভেড়ার বেশিরভাগ প্রজাতি কৃষি-বাস্তুসংস্থানগত অবস্থার প্রাকৃতিক অভিযোজনের মাধ্যমে অভিযোজিত হয়েছে এবং বেশ কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিযোজন সম্পন্ন হয়েছে, বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রজাতিগুলোর নামকরণ করা হয়েছে তাদের উৎপত্তিস্থল বা বিশেষ চরিত্রের ভিত্তিতে। ভারতে ভেড়ার ৪০ টিরও বেশি নিবন্ধিত প্রজাতি রয়েছে।

এদের মধ্যে গাড়োল প্রজাতির ভেড়ার দীর্ঘকালীন খরার সময় অর্ধাহারের মধ্যেও তাদের বেঁচে থাকার দুর্দান্ত ক্ষমতা রয়েছে এবং চরম আবহাওয়া সহ্য করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে বহিঃ-পরজীবী এবং অন্তঃ-পরজীবী ঘটিত রোগের প্রবণতা কম। গাড়োলের দেহের পশম বায়ুচলাচলের জন্য উপযুক্ত, এবং তা ত্বককে তীব্র রোদ, বৃষ্টি এবং ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করে। এদের মধ্যে রয়েছে উচ্চ প্রজনন-ক্ষমতা, নোনা জলাভূমি, গরম এবং আর্দ্র জলবায়ুর সাথে মানিয়ে নেবার যোগ্যতা। এটি হাঁটু গভীর জলে জলজ আগাছা এবং ঘাস খেতে পারে। এদের স্বাস্থ্যকর ত্বক রয়েছে এবং এর মাংসকে মাটন বলা হয়, যা কম চর্বিযুক্ত। এর গড় প্রজনন সংখ্যা ২.২৭, অর্থাৎ প্রতিবার বিয়ানে গড়ে দুটির বেশী বাচ্চা দেয়। উচ্চ প্রজনন-ক্ষমতা এবং নিম্নমানের পশুখাদ্য ব্যবহার সত্বেও দ্রুত মাংস বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চ প্রানীজ-উৎপাদনের ক্ষমতার কারণে গাড়োল ভেড়া প্রানীসম্পদের মাধ্যমে আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে।

গাড়োলের প্রাকৃতিক আবাসস্থল (২১^{0}-২৩^{0}) উত্তর অক্ষাংশ এবং (৮৭^{0}-৮৯^{0}) পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ১৩টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল যার পশ্চিমে রয়েছে হুগলি নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। সমগ্র এলাকা প্রায় ৪২২৬ বর্গ-কিলোমিটার প্রসারিত। এটি গঙ্গা নদীর নিম্নভূমি এলাকা এবং গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে ২০০ মিটার সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত। সুন্দরবনের বড় অংশ বাংলাদেশে অবস্থিত এবং সেখানেও গাড়োল ভেড়া পাওয়া যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর-১, জয়নগর-২, কুলতলী, মেদিনীপুর-১, মেদিনীপুর-২, পাথরপ্রতিমা, নামখানা এবং কাকদ্বীপ

ব্লকে গাড়োলের সংখ্যা বেশি। এইসব এলাকায় ভেড়ার আবাসস্থল প্রায়ই জলে প্লাবিত হয় এবং জমির বেশিরভাগ অংশতেই অপর্যাপ্ত সেচ সুবিধা রয়েছে। তাই এখানকার জমি বৃষ্টিনির্ভর। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ১৮০০-২০০০ মিলিমিটার। মাটির পি. এইচ (pH) ৬.৭-৭.৬ এর মধ্যে পরিবর্তিত হয় এবং গড় সর্বনিন্ম এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৫.৫^0 সেলসিয়াস এবং ৩২.৫^0 সেলসিয়াস এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রায় ৮০%। গাড়োল ভেড়ার চারণক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক চারণভূমি, যার মধ্যে রয়েছে কাটা ফসলের ক্ষেত, ফসল ক্ষেতের সীমানা, রাস্তার পাশের সেচ-নালার পাড়, জলাশয়, নদীর জলাশয়, নিচু জমির এলাকা ইত্যাদি। যদি চারণভূমি পাওয়া না যায়, ভেড়া ধানের পতিত জমিতে চরতে পারে। ভারত সরকারের প্রানী প্রজাতি পরিসংখ্যান (২০১২) অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গাড়োল ভেড়ার আনুমানিক সংখ্যা ০.১৬ মিলিয়ন।

পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক গাড়োল ভেড়ার পরিসংখ্যান (২০১২)

গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীসম্পদ হল গাড়োল ভেড়া। বিভিন্ন গুহাচিত্র ও সুপ্রাচীন শিলমোহরে গাড়োল ভেড়ার ছবি প্রমাণ করে অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশের মানুষ গাড়োল ভেড়া পালন করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণ ও আদ্র আবহাওয়ায় খুব সহজেই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গাড়োল ভেড়া পালনের

মাধ্যমে অধিক লাভ করা যায়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জীবিকার চাহিদা মেটাতে, বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে, পুষ্টির অভাব মেটাতে এবং নারী উন্নয়নে প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে গাড়োল ভেড়া পালন অন্যতম উপায়।

গাড়োল ভেড়ার উৎস

'গাড়োল', একটি কথ্য বাংলা শব্দ, যার অর্থ বোকা। বিবেচনাহীন অন্ধ-অনুকরন, আপাতদৃষ্টিতে মূর্খতাপূর্ণ চাহনি ও মনোভাব, সামান্যতম ঘটনায় আতঙ্কিত হওয়া ইত্যাদি আচরণ এবং অভ্যাসের কারণে, সম্ভবত ভেড়ার এই জাতটি 'গাড়োল' নামে পরিচিত।

ধারণা করা হয় যে গৃহপালিত গাড়োল ভেড়া (*Ovis aries*) এশিয়ার ইউরিয়াল (*Ovis vignei*) থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে। ভেড়াগুলি তাদের মালিকের সাথে সুন্দরবন অঞ্চলের নদীতীরবর্তী বনাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়, এই অঞ্চলে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় এখানকার প্রতিটি বসতি স্থাপনকারী ছিল নিগ্রোয়েড স্টক এবং তারা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, হোমো আলপাইনস, প্রোটো নর্ডিক এবং আর্যদের অনুসরণকারী। বেশ কিছু তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় ১৮ শতকের শেষের দিকে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত মেরিনহো ভেড়ার (Davis, 2002) বুরুলা জিনের মিউটেশন এই ভেড়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছিল। গাড়োল ভেড়ার এই গুনের জন্য ১৭৯২ সালে বাংলা থেকে অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি করা হয়েছিল এবং মেরিনো ভেড়ার বংশবৃদ্ধিতে এই বুরুলা জিনের অবদান রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় মেরিনো ভেড়ার সঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের গাড়োল ভেড়ার গঠনগত এবং পশম বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে। গাড়োল হল মরফোজেনেটিক প্রোটিন রিসেপ্টর-১বি (BMRR- ১৩) (Willson *et al.* 2001 – a,b) এর মিউটেশনের ফলাফল যা পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের গাড়োল ভেড়াতে পরিলক্ষিত হয় (Davis *et al.* 2002)।

এই জন্য ভারতে ভেড়ার জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ খুবই প্রয়োজন। মলিকিউলার জেনেটিক চরিত্রায়ণ করার জন্য মলিকিউলার মার্কার প্রয়োজন। মাইক্রোস্যাটেলাইটগুলি জাতের বিবর্তন এবং জিন একত্রীকরণ উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সরবরাহ করে, কারণ এগুলি এই জাতটির সংরক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গাড়োল ভেড়ার বৈচিত্র্য

সুন্দরবনের ১৩টি ব্লক, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা ছাড়াও বাংলাদেশের কিছু এলাকায় (মেহেরপুর, ঘোড়াডাঙ্গা এবং সুন্দরবন ব-দ্বীপ এলাকা) গাড়োল ভেড়া পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় এটি সাধারণত পাওয়া যায়। জলবায়ুগত কারণ, যেমন- সূর্যালোক, বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রা ইত্যাদি পরোক্ষভাবে ভেড়ার বিপাকীয় কার্যকলাপ প্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে প্রাণীজ প্রোটিনের অন্যতম উৎস হিসাবে গাড়োল ভেড়া পালনকে স্থায়ী করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। লক্ষ্য করা গেছে বাড়ীর মহিলারা বেশিরভাগ গাড়োল পালনের সাথে জড়িত, কারণ বাড়ীর অন্যান্য কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে এই ভেড়াটি পালন করা সম্ভব এবং একসঙ্গে এটি তাদের পরিবারের অর্থনীতিকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

ভেড়ার রূপগত বৈশিষ্ট্য:

- লম্বার ওপর ভিত্তি করে গাড়োল ভেড়ার তিনরকম ধরনের কান রয়েছে- প্রাথমিক (১-৩ সেমি), মাঝারি (৪-৮ সেমি) এবং লম্বা (৮ সেমির বেশি।

- উন্মুক্ত মোটা পশম, খুব ঘন নয়, পুরো শরীর এবং পায়ের বেশিরভাগ অংশ ঢেকে রাখে।

- তাদের আঁটোসাঁটো (দৃঢ়) বর্গাকার শরীর, ছোট মাথা এবং ছোট পাতলা লেজ রয়েছে। মাথা সোজা, শরীরের চেয়ে একটু উঁচু, নাক সোজা, মুখ ছোট ও ফ্যাকাশে ক্রিম বা কালো। চোখ কালো, মুখ লম্বা, ঘাড় লম্বা, ভারী, ব্যারেলের মতো। পুরুষ ভেড়া শিংযুক্ত কিন্তু স্ত্রী ভেড়া শিংবিহীন হয়।

স্ত্রী গাড়োল ভেড়া

পুরুষ গাড়োল ভেড়া

গাড়োল ভেড়া পালনের উপযোগিতা

১। গাড়োল ভেড়া আকারে ছোট ও শান্ত স্বভাবের জন্য পারিবারিক শ্রমের (বাড়ীর ছেলে, বয়স্ক বা মহিলার) পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে অল্প মূলধন ও অল্প জায়গায় চাষ করা যায়।

২। গাড়োল ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি এবং চড়িয়ে পালন করলে খাবারের খরচ খুব কম হওয়ায় প্রতিপালন খরচ খুব কম। যেহেতু গাড়োল বহিরাগত পরজীবী থেকে মুক্ত, তাই গাড়োলের পালন ভেড়াপালকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

৩। গাড়োল ভেড়ার মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এবং মাংস খাবার ব্যাপারে ধর্মীয় সংস্কার না থাকায় বাজারে মাংসের চাহিদা প্রচুর। গাড়োল ভেড়া মূলত মাংস (উচ্চগুণমানের মাটন) উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। কিছু জায়গায় স্ত্রী ভেড়া ৬-৮ টি বাচ্চা দেবার পর তা বিক্রি করা হয়। গাড়োল ভেড়া থেকে খাদ্য যোগ্য মাংসের পরিমাণ দৈহিক ওজনের (৪৮-৫৮) শতাংশ। ভারতে ভেড়ার মাংসের ভালোই চাহিদা রয়েছে, তবে প্রতিদিন মাথাপিছু মাংস ভক্ষণ করা হয় মাত্র ১৬ গ্রাম, যেখানে প্রতিদিন মাথাপিছু মাংস ভক্ষণ করা উচিত ৩৪ গ্রাম, আই. সি. এম. আর (ICMR) এর সুপারিশ অনুসারে। ইংরাজিতে ভেড়া থেকে প্রাপ্ত মাংসকে বলা হয়

মাটন এবং ছাগলের মাংসকে বলা হয় চেভন। গাড়োল ভেড়ার মাংসে চর্বি অন্যান্য প্রজাতির ভেড়ার তুলনায় প্রায় অর্ধেক। যারা মাংসে চর্বির পরিমান কম পছন্দ করেন, তাঁদের এই মাংস খুবই পছন্দের হবে, তা বলাবাহুল্য। এই মাংসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ খনিজও (সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরিন, দস্তা, তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি) যথেষ্ট পরিমানে থাকে। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী (Mondal *et al.,* 2023) গাড়োলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর (মুক্তাঙ্গনে পালিত ভেড়া ও খামারে পালিত ভেড়া) ভেড়ার দেহের গঠন বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। মাংসের গুণগত মানগুলি, যেমন জল ধারণ ক্ষমতা (WHC)- (৪০-৪৫)%, pH- (৫.৫-৬)%, হিমায়নের ক্ষতি- (০.৮০-০.৮৫)%, মাংসের ফাইবারের ব্যাস, ইত্যাদি খামারে পালিত ভেড়ার থেকে মুক্তাঙ্গনে পালিত ভেড়ার মাংসে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, অন্যদিকে মাংসের প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি রয়েছে খামারে পালিত ভেড়ার ক্ষেত্রে। গাড়োলের মাংসে আর্দ্রতার পরিমাণ- (৭০-৭৬)%, প্রোটিন- (১৬.৫-১৮)%, চর্বি- (৩-৪)% এবং কার্বোহাইড্রেট- (০.৪৫-০.৬০)%। খামারে পালিত ভেড়ার মাংসের রং, চেহারা, গন্ধ, মুক্তাঙ্গনে পালিত ভেড়ার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ভালো। উৎকৃষ্ট মানের মাংস পাবার জন্য গাড়োল ভেড়ার কসাই করার বয়স পুরুষ ভেড়ার ক্ষেত্রে (৮-১২) মাস এবং স্ত্রী ভেড়ার ক্ষেত্রে ২৪ মাসের বেশি, কসাইয়ের সময় ওজন যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী ভেড়াদের জন্য গড়ে (১০-১২) কেজি এবং (১২-১৪) কেজি। তাই নিঃসন্ধেহে বলা যায় ভারতীয় মাংস উৎপাদন ব্যবস্থায় গাড়োল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৪। গাড়োল ভেড়ার দুধ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এবং সহজে হজম হওয়ায় শিশু, বয়স্ক এবং পেট খারাপের (অজীর্ণ রোগী, লিভারের সমস্যাজনিত) রোগীর জন্য গাড়োল ভেড়ার দুধের ও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

৫। গাড়োল ভেড়া থেকে প্রাপ্ত উপজাত দ্রব্য চামড়ার, লোমের বিশ্বজুড়ে চাহিদা রয়েছে। কিছু মেষপালনকারী ভেড়ার পশম ছাঁটেন তা বিছানা-পত্রের উপাদান হিসেবে ব্যবহারের জন্য। গাড়োল ভেড়ার পশম অত্যন্ত মোটা (৮০% এর বেশি মোটা লোমযুক্ত ফাইবার পাওয়া যায়), তবে খুব ঘন নয়। গাড়োলের উল বা পশমের

বৈশিষ্ট্যেগুলি হল- ভেড়া প্রতি বার্ষিক পশমের উৎপাদন (১৫০-৪০০) গ্রাম, স্থিতিশীল দৈর্ঘ্য (৫-৭) সেমি, পশমের ব্যাস (৫০-৭০) মাইক্রন, মেডুলেশন (৭৫-৮০)%, পশমবহুলতা (৫৫-৬০)%। মোটা উলের তন্তু কার্পেট, কম্বল ও অন্যান্য দ্রব্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তাই এই ভেড়ার পশম গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য ছোট আকারের কুটির শিল্পের অধীনে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

৬। চামড়ার গুণমান সম্পর্কে বলা যায়, দৈর্ঘ্যে-(৬০-৮৫) সেমি, প্রস্থ-(৫০-৬৫) সেমি, ভেজা চামড়ার ওজন (১-২.৫) কেজি, শুষ্ক চামড়ার ওজন-(৫০০-৬০০) গ্রাম, চামড়ার মোট পরিধি-(৩০০০-৫৫০০) বর্গসেমি। আকার আয়তনে বাংলার কালো ছাগলের চামড়ার সাথে তুলনীয়।

৭। গাড়োল ভেড়ার মল ও মুত্র থেকে উন্নতমানের জৈবসার তৈরী করা যায়।

গাড়োল পালনকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য, তাদের ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু সংরক্ষণ প্রয়োজন এবং বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই তার ভাল অগ্রগতি হয়েছে। তাদের চামড়া লেদার উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় পাশাপাশি তাদের মলমূত্র সার তৈরির কাজেও ব্যবহার করা হয়। গাড়োল ভেড়ার বিশেষ ক্ষমতার কারণে, সরকার, এনজিও এবং অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাগুলি আরও বিজ্ঞানসম্মত এবং উন্নত গাড়োল পালন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অত্যাবশ্যকীয় পরিকাঠামো তৈরির সাথে সাথে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে গাড়োল ভেড়া পালকদের মধ্যে স্থায়ী জীবিকা নির্বাহে যথেষ্ট সাহায্য করবে। ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবন-জীবিকার উন্নতির মহান সুযোগ, বিশেষ করে ভেড়া পালনের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

গাড়োলের মাংস, দুধ, উল, চামড়া এই সবেরই বাজারে চাহিদা রয়েছে। গাড়োল ভেড়া থেকে প্রাপ্ত পশম দিয়ে কার্পেট এবং প্রার্থনার মাদুর তৈরি এবং চামড়া থেকে সুন্দর চামড়ার ব্যাগ তৈরির মাধ্যমে নতুন কুটীর শিল্প চালনা করা যেতে পারে। গাড়োলের দুধ পান করা ছাড়াও বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরির জন্য ব্যবহার করা

যেতে পারে। যেহেতু গাড়োলের মাংস নরম এবং সস্তা, তাই এটি দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরের দেশের গ্রাহকদের কাছেও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে। গাড়োল পালকদের বিশেষত মহিলাদের এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির (এসএইচজি) মাধ্যমে এই সমস্ত গাড়োল-ভিত্তিক পণ্যগুলি তৈরির সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এর সুদূর প্রসারী আর্থ-সামাজিক প্রভাব ফেলতে পারে।

সরাসরি গাড়োল পালনের মাধ্যমে ছাড়াও এই পালন প্রক্রিয়াকে সচল রাখার জন্য অভিসারী ও অনুসারী শিল্প যেমন প্রাণীখাদ্য, বাচ্চা তৈরি, পরিবহন শিল্প, চিকিৎসা, ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে বেকারত্ব কমানো সম্ভব।

গাড়োল ভেড়ার চামড়ার ব্যাগ

উল ও পাটের মিশ্রণে তৈরি কার্পেট

উল ও তুলার সুতোর মিশ্রণে তৈরি জ্যাকেট

ভেড়ার বিভিন্ন প্রজাতি

ভারতে ভেড়ার ৪৪টি প্রজাতি আছে যদিও এর বেশীর ভাগ দেশীয় (non-descript) । ভেড়ার প্রজাতিগুলোকে বাসস্থান অনুযায়ী চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। নাতিশীতোষ্ণ উত্তরাঞ্চলের ভেড়া:

গাড্ডি (Gaddi), রামপুর-বাসেহার (Rampur-Bushair), ভাকারওয়াল (Bhakarwal), গুরেজ (Gurez), কাশ্মীর মেরিনো (Kashmirmerino), চ্যাঙ্গথাঙ্গি (changthangi), পুঞ্চি (poonchi) ইত্যাদি। এই ভেড়ার প্রজাতিগুলি পশম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এদের জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে পাওয়া যায়।

গাড্ডী

রামপুর-বাসেহার

ভাকড়াওয়াল

গুরেজ

কাশ্মীর মেরিনো

চ্যাঙ্গথাঙ্গি

পুঞ্চি

২। শুষ্ক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভেড়া:

চোকলা (chokla), নালি (Nali) মারওয়ারি (marwari), জয়সলমিরি (Jaisalmeri), পুঙ্গল (Pungal) সোনাদি (Sonadi), মালপুরা (malpura), মুজাফরনগরি (muzaffarnagi) মগরা (magra) ইত্যাদি। এই অঞ্চলে রাজস্থান, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ পড়ে। উপরোক্ত প্রজাতিগুলি মাংস এবং পশমের জন্য পালন করা হয়।

চোকলা

নালি

মারওয়ারি

জয়সলমিরি

পুঙ্গল

সোনাদি

মালপুরা

মুজাফরনগরি

মগরা

৩। দক্ষিণাঞ্চলের ভেড়া:

ডেকানি (Decani), নেল্লোর (Nellore), হাসান (Hassan), নীলগিরি (Nilgirn), মন্দ্যা (Mandya), মাদ্রাজ রেড (Madras Red), মাচেরি (Macheri)। উপরোক্ত প্রজাতিগুলি অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যে প্রধানত মাংসের জন্য পালন করা হয়।

ডেকানি

নেল্লোর

হাসান

নীলগিরি

মন্দ্যা

মাদ্রাজ রেড

মাচেরি

৪। পূর্বাঞ্চলে ভেড়ার প্রজাতি:

আর্দ্র পরিবেশ হওয়ার জন্য ভেড়া পালন এই অঞ্চলে ততটা লাভজনক নয়। উল্লেখযোগ্য ভেড়ার প্রজাতিগুলি হল ছোটনাগপুরি (chotanagpuri), সাহাবাদী (shahabadi), গুঞ্জাম (Gangam) বনপালা (Bonpala), তিব্বতী (Tibbati), গাড়োল, (Garole) বলাঙ্গীর (Balangiri) ইত্যাদি।

ছোটনাগপুরি

সাহাবাদী

গুঞ্জাম

বনপালা

তিব্বতী

গাড়োল

বলাঙ্গীর

এছাড়া ভারতে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বিদেশী প্রজাতির (Exotic) ভেড়া সংকরায়নের জন্য পালন করা হয়। যেমন মাংসের জন্য সাফোল্ক (suffolk), ডরসেট (Dorset), সাউথডাউন (Southdown)।

পশমের জন্য মেরিনো (Merino), রাম্বউল্লেট (Rambouillet), পোলওয়ার্থ (polworth)। দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে (মাংস ও পশম) করিডেল (corriedale) এবং পেল্ট (pelt)-এর জন্য কারাকুল (karakul) ইত্যাদি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত তিনটি প্রজাতির ভেড়া পালন করা হয় যথা-সাহাবাদি, ছোটনাগপুরি ও গাড়োল। তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হল।

মেরিনো

রাম্বউল্লেট

পোলওয়ার্থ

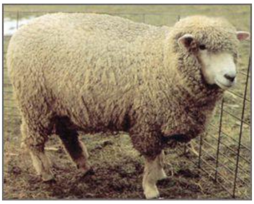

করিডেল

কারাকুল

সাহাবাদি (Shahabadi):

উৎপত্তিস্থল (Origin): সাহাবাদি ভেড়ার আদি বাসস্থান বিহারের পাটনা, গয়া, এবং সাহাবাদ জেলা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতেও সাহাবাদি ভেড়া পালন করা হচ্ছে, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে।

প্রজাতি বৈশিষ্ট্য (Breed characteristics): মাঝারি চেহারা, লম্বা পা ও লেজ, টিকালো রোমান নাক, কান মাঝারি মাপের ও ঝুলন্ত, গায়ের রং সাদা বা হালকা বাদামি মাঝে মাঝে কালো ছোপ থাকে। এদের শিং থাকে। পায়ে ও পেটে খুব ছোট ছোট পশম থাকে। পরিণত পুরুষ ভেড়ার ওজন গড়ে ২৫-৩০ কেজি এবং স্ত্রী ভেড়ার ২০-২৫ কেজি। এক একটি ভেড়া থেকে বছরে ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পশম পাওয়া যায়। এদের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

ছোটনাগপুরি (Chotonagpuri):

উৎপত্তিস্থল (Origin): বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি। বর্তমানে বিহারের ছোটনাগপুর, রাঁচী, হাজারিবাগ, সিংভূম, ধানবাদ, সাঁওতাল পরগনাতে এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলাতে দেখা যায়।

প্রজাতি বৈশিষ্ট্য (Breed characteristics): গায়ের রং হালকা বাদামী থেকে ধূসর। ছোট চেহারা, কান ও লেজ ছোট, শিং বর্তমান, পশম মোটা হয়। পরিণত বয়সে এদের গড় ওজন ১৫-২০ কেজি। এদেরও দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

গাড়োল (Garole)

উৎপত্তিস্থল (Origin): গাড়োল পশ্চিমবাংলার একমাত্র স্বীকৃত ভেড়ার প্রজাতি। প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় এদের পাওয়া যায় বা আরও সঠিকভাবে বললে সুন্দরবন এলাকায়।

প্রজাতি বৈশিষ্ট্য (Breed characteristics): গাড়োল কথাটি অর্থ হল বোকা, এই নামকরণের কারণ এদের অত্যন্ত ভীতু স্বভাব, বোকা বোকা স্বভাব। ছোট দেহ অবয়ব, শিংযুক্ত, গায়ের রং বিভিন্ন রঙের হয়। সাদা বাদামী, ধূসর, কালো বা উপরোক্ত দুটি রঙের সংমিশ্রণ। গায়ের পশম খুব মোটা, যার বাজার মূল্য খুব একটা নেই বললেই চলে। লেজ খুব ছোট। এদের কান খুব ছোট। গাড়োল একমাত্র ভেড়ার প্রজাতি যে খরা জলে বা কর্দমাক্ত জমিতে ঘুরে বেড়ায়। এরা প্রতি বিয়ানে গড়ে প্রায় দুটি করে বাচ্চা দেয়। এদের প্রধানত মাংসের জন্য পোষা হয়।

প্রজাতিগত শ্রেণীবিভাগ

আমাদের রাজ্যে তিন ধরনের ভেড়া দেখতে পাওয়া যায় - গাড়োল, বনপালা এবং ছোটনাগপুরি, এই তিন প্রজাতির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি নীচে দেওয়া হল।

নং	বৈশিষ্ট্য	গাড়োল	বনপালা	ছোটনাগপুরি
১	প্রাপ্তিস্থান	পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা	পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলা ও সিকিম	পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং ঝাড়খন্ড
২	প্রধান ব্যবহার	মাংস হিসেবে	মাংস ও উল	মাংস ও উল
৩	দৈহিক বৈশিষ্ট	সাধারণত ধূসর বর্ণের এবং আকারে ছোট। পূর্ণ বয়স্ক ভেড়ার গড় ওজন ১৪-১৬ কেজি। ছোট ছোট দলবদ্ধ অবস্থায় চরে বেড়ায়। শিং খুবই ছোটো হয়। এই ভেড়ার তিন ধরনের কান দেখা যায়। যেমন - লম্বা কান, মাঝারি লম্বা কান ও একদম ছোট	সম্পূর্ণ সাদা বা কালো অথবা সাদা-কালো বর্ণের আকারে বেশ লম্বা ও শক্তপোক্ত গঠন, টিয়া পাখির ঠোটের মত বাঁকানো নাক, পূর্ণবয়স্ক ভেড়ার ওজন ৫০-৫৫ কেজি। ছাড়া অবস্থায় চরতে ভালোবাসে।	সাধারণত বাদামী বর্ণের। তবে সাদা, কালো এবং কালো বাদামী বর্ণেরও হয়। আকারে ছোট, শিং চ্যাপ্টা, পাশে পিছনে ও নীচের দিকে বিস্তৃত হয় । পূর্ণবয়স্ক ভেড়ার ওজন ১৮-২০ কেজি।

		কান।		
৪	প্রজননগত বৈশিষ্ট্য ক) প্রথমবার বাচ্চা দেওয়ার বয়স, খ) দুবার প্রসবের মধ্যে ব্যবধান, গ) বাচ্চা দেওয়ার হার	১৪ - ১৬ মাস ৬ - ৮ মাস ২ - ৩ টি	২৪ মাস ১২ মাস ১ টি	১২-১৪ মাস ৬-৮ মাস ১-২ টি
৫	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা পৃথিবীর সব ভেড়া প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি, সুন্দরবনের মত নীচু জলা জঙ্গলে এবং আদ্র	যাযাবর শ্রেণিভুক্ত এবং বিভিন্ন উচ্চতায় মানিয়ে চলার ক্ষমতা আছে।	রুক্ষ ও শুকনো পরিবেশে মানিয়ে চলার ক্ষমতা সম্পন্ন

		নোনা পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে।		
৬	ছবি			

শরীরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত কিছু তথ্য নীচে দেওয়া হল:

শরীরের গড় পরিমাপ:

	পুরুষ ভেড়া	**স্ত্রী ভেড়া**
শরীরের ওজন	(১৫-২০) কেজি	(১৩-১৭) কেজি
শরীরের দৈর্ঘ্য	(৪০-৫৫) সেমি	(৪০-৫০) সেমি
উচ্চতা	(৪০-৫০) সেমি	(৪০-৫০) সেমি
বুকের ঘের	(৫৫-৬০) সেমি	(৫৫-৫৮) সেমি

কিছু ভারতীয় প্রজাতির ভেড়ার ছবি

ত্রিরুচি (কালো)

কোয়েম্বাটুর

জালাউনি

পতন্বাদী

রাম্নাদ (সাদা)

কর্না

কেঙ্গুরি

কিলাকার্সাল

বেল্লাড়ী

ভেম্বুর

কিছু বিদেশি প্রজাতির ভেড়ার ছবি

সাফোল্ক

ডরসেট

সাউথডাউন

মেরিনো

রাম্বউল্লেট

পোলোয়ারথ

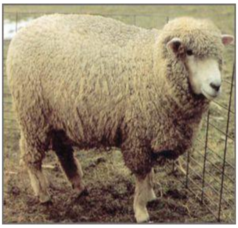
কড়িডেল

কারাকুল

গাড়োল ভেড়ার বাসস্থান

গাড়োল ভেড়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি, প্রজনন, অসুস্থতা, রোগ সংক্রমন প্রভৃতি গাড়োল ভেড়ার ঘরের অবস্থান, নির্মাণ, পরিমাপ, ঘরের পরিবেশের (শুষ্কতা, আদ্রতা, বায়ু চলাচল, তাপমাত্রা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) ওপর সরাসরি সম্পর্কিত।এই সমস্ত কারনের জন্যই ব্যাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে গাড়োল ভেড়া পালনের জন্য গাড়োল ভেড়ার লিঙ্গ, বয়স ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পনামাফিক ঘর বানানো অতি আবশ্যক।

গাড়োল ভেড়া পালনের আদর্শ ঘর

১. ঘরটিকে উঁচু জায়গায় করতে হবে, যেন বৃষ্টির সময় জল না জমে।

২. ঘরটিকে পূর্বপশ্চিমে করলে অর্থাৎ ঘরটি দক্ষিনমুখী করলে ঘরের ভিতর ভালভাবে বায়ু চলাচল করতে পারে। দক্ষিণ দিক ও উত্তর দিক খোলা থাকবে যাতে সূর্যের আলো ঢুকতে পারবে ও হাওয়া বাতাস চলাচল করতে পারবে।

৩. ঘরের ছাদ (টিন, টালি, এসবেসটস, খড় ইত্যাদি) একচালা বা দুচালা করা যেতে পারে, তবে দুচালা ছাদ ভালো।

৪. ঘরের মাঝ বরাবর উচ্চতা ১০ ফুট এবং দুই ধারের উচ্চতা ৮ ফুট রাখতে হবে।

৫. ঘরের মেঝে সিমেন্টের, কাঠের বা বাঁশের পাটাতনের (দুটো টুকরোর মাঝে যেন ১ ইঞ্চিরও কম ফাঁক থাকে) হতে হবে। মেঝে ঢালু (১০ ফুটে ১ ইঞ্চি) রাখতে হবে। ঘরের মেঝে মাটি থেকে ২ ফুট উঁচু থাকতে হবে। ঘরের দেওয়াল ও মেঝে মসৃণ ও কোন বিহীন হবে। একটি বাঁশের তৈরী পাটাতন রাখতে হবে যাতে মাটির ঠাণ্ডা রাত্রিবেলায় ভেড়ার গায়ে না লাগে।

৬. ভালভাবে ঘর পরিষ্কার রাখার জন্য ভালো নালার ব্যাবস্থা রাখতে হবে। ঘর সব সময় শুকনো রাখতে হবে।

৭. ঘরের মেঝেথেকে কমপক্ষে ৩ ফুট উঁচু শক্ত দেওয়াল (ইটের দেওয়াল এবং ভিতরের দিকে সিমেন্টের প্লাস্টার) এবং বাকি অন্তত ৫ ফুট তারের জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। শীতকাল ও বর্ষাকালে ঘরের যে অংশ খোলা আছে, শীত ও বৃষ্টির থেকে বাঁচার জন্য তারজালের চারিদিকে পলিথিন ঝোলানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. ঘরের দুপাশে সিমেন্টের বা মোটা শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি খাবারের এবং জলের পাত্র রাখতে হবে।

৯. ঘরের মধ্যে একটি ছোট জায়গা ও ৩ ফুট উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে গাভীন ভেড়ার সুরক্ষিত ভাবে বাচ্চা দেওয়ার জন্য।

১০. খাবারের পাত্রের ৩ ফুট উঁচুতে দেওয়াল ঘেঁষে টানা একটি করে দুপাশে দুটি লোহার রড বা বাঁশ বেঁধে দিতে হবে, যাতে সবুজ ঘাস বা পাতা ঝুলিয়ে রাখা যায়। অথবা ঘরের মধ্যে কিছু বাঁশের খুঁটি রাখতে হবে যাতে গাছের পাতা ঝুলিয়ে ভেড়াকে খাওয়ানো যায়। (Artificial Browsing)

১১. শীতকালে একটি মাটির হাঁড়ির মধ্যে কয়লা দিয়ে ভেড়ার ঘরটি গরম রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে, বিশেষ করে ভোরবেলায়। এখানে মনে রাখতে হবে মাটির পাত্রে ছিদ্র করে নিতে হবে এবং আগুন যাতে কোনোভাবে ভেড়ার গায়ে না লাগে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

ভেড়ার প্রকার	**খাবারের/জলের পাত্রের দৈর্ঘ্য (সেমি)**	**খাবারের/জলের পাত্রের প্রস্থ (সেমি)**	**খাবারের/জলের পাত্রের উচ্চতা (সেমি)**
পরিণত ভেড়া	৫০	৩০	৩৫
ভেড়ার বাচ্চা	৪০	২০	২৫

গাড়োল ভেড়ার ঘরের পরিমাপ

১. (১-৩) মাস বয়স পর্যন্ত প্রতিটি বাচ্চা গাড়োল ভেড়ার জন্য ৪ বর্গফুট করে জায়গা দরকার।

২. (৩-৬) মাস বয়স পর্যন্ত প্রতিটি গাড়োল ভেড়ার জন্য ৬ বর্গফুট করে জায়গা দরকার।

৩. (৭-১২) মাস বয়স পর্যন্ত প্রতিটি গাড়োল ভেড়ার জন্য ৯ বর্গফুট করে জায়গা দরকার।

৪. ১২ মাসের বেশি (পূর্ণবয়স্ক) প্রতিটি গাড়োল ভেড়ার জন্য ১২ বর্গফুট করে জায়গা দরকার।

৫. গর্ভবতী গাড়োল ভেড়ার জন্য ১৫ বর্গফুট করে জায়গা দরকার।

৬. বাচ্চা প্রসবের পর বাচ্চা সহ মা গাড়োল ভেড়ার ২ মাস থাকার জন্য ২০ বর্গফুট করে জায়গা দরকার।

৭. পাঁঠাকে ৮ মাস বয়সের পর থেকে আলাদা রাখতে হবে।

১০০ টি স্ত্রী গাড়োল ভেড়া ও ১০ টি পুরুষ গাড়োল ভেড়া নিয়ে ফার্ম করলে বাসস্থানের ব্যবস্থা নিন্মরূপ

১. ১০০ টি স্ত্রী গাড়োল ভেড়ার জন্য একটি ঘর। প্রতিটি গাড়োল ভেড়ার জন্য ১২ বর্গফুট হিসাবে মোট ১২০০ বর্গফুট।

২. ১০ টি পুরুষ গাড়োল ভেড়ার জন্য একটি ঘর। প্রতিটি পুরুষ গাড়োল ভেড়ার জন্য ১৫ বর্গফুট হিসাবে মোট ১৫০ বর্গফুট।

৩.৩০ টি গর্ভবতী গাড়োল ভেড়ার জন্য একটি ঘর। প্রতিটি গর্ভবতী গাড়োল ভেড়ার জন্য ১৫ বর্গফুট হিসাবে মোট ৪৫০ বর্গফুট।

চারণভূমিতে ভেড়া

স্বল্প খরচে নির্মিত বাসস্থান

স্বল্প খরচে নির্মিত বাসস্থান

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভেড়া পালনের বাসস্থান

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভেড়া পালনের বাসস্থান

খামারের প্যাডকে ভেড়ার দল

আদর্শ ভেড়ার ঘরের কিছু খন্ডচিত্র

গাড়োল ভেড়ার খাবার

ভেড়া চরে খেতে পছন্দ করে। তাই চারণভূমিই হল ভেড়ার খাবারের মূল উৎস। বাড়ির চত্বরে পালন পদ্ধতিতে পালন করলে দৈনিক ৬-৮ ঘন্টা প্রতিটি ভেড়াকে চরে খাবার সংগ্রহের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। গাড়োল প্রজাতির ভেড়া জলে ডোবা জমি, নিম্নভূমি প্রভৃতি স্থান থেকে খাবার সংগ্রহ করতে বিশেষ ভাবে সক্ষম। সামান্য তৃণ বা কাঁটাজাতীয় পাতার সদ্ব্যবহার করে এরা পুষ্টিলাভ করতে পারে। আবার সুন্দরবনের নোনা জলজ পরিবেশ, যেখানে অন্য কোনও গৃহপালিত প্রাণী ভালভাবে বসবাস করতে পারে না, সেখানে গাড়োল প্রজাতির ভেড়া দিব্যি বেঁচে থাকে এবং গরিব মানুষের বন্ধু হয়ে ওঠে। তবে, বাচ্চার দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য, প্রজননক্ষম পুরুষ ভেড়ার স্বাস্থ্যের জন্য, প্রসুতি ভেড়ার সঠিক পুষ্টির জন্য এবং মাংস উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় ভেড়ার খাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। সুষম খাবার ভেড়ার পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রদান ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। খাদ্য প্রদান ব্যবস্থায় হঠাৎ করে কোনো পরিবর্তন করা উচিত নয়, তবে তা ধীরে ধীরে করা যেতে পারে।

অল্পসংখ্যক গাড়োল ভেড়ার জন্য মাঠে ছেড়ে পালন করলে গাড়োল ভেড়া তার প্রয়োজনীয় খাবারের শতকরা ৮০ ভাগ নিজেই জোগাড় করে নেয় এবং অল্প পরিমান দানা খাবার দিলেই তা লাভজনক হয়, কিন্তু বেশি সংখ্যায় গাড়োল ভেড়া পালনের জন্য গাড়োল ভেড়ার খাবারের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। গাড়োল ভেড়াকে প্রতিদিন কতটা খাওয়াতে হবে তা নির্ভর করে গাড়োল ভেড়ার ওজন, বয়স, শারীরিক অবস্থা (গর্ভবতী, দুগ্ধবতী) ইত্যাদির ওপর। মাংসের জন্য পালিত গাড়োল ভেড়ার দৈনিক খাবারের (শুষ্ক পদার্থ) প্রয়োজন তার দেহের ওজনের শতকরা (৩-৪) ভাগ। দুধ এবং মাংসের জন্য পালিত গাড়োল ভেড়ার দৈনিক খাবারের (শুস্ক পদার্থ) প্রয়োজন তার দেহের ওজনের শতকরা (৪-৬) ভাগ। গাড়োল ভেড়ার দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্যের ২/৩ অংশ তন্তুজাতীয় (খড় ও সবুজ ঘাস) এবং বাকি ১/৩ অংশ দানাখাবার দিলে ভালো হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক গাড়োল ভেড়ার আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী প্রতিদিন (৫০০-৮০০) মিলি জল প্রয়োজন।

সারাদিন চরে খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান ঘাস-পাতা (কেমপক্ষে ৩-৫ কেজি) জাতীয় খাদ্য পাওয়া দরকার। যদি শুঁটি জাতীয় ঘাস (বারসীম, লুসান, মটর, ধান প্রভৃতি) পাওয়া যায় তাহলে সুষম বা দানা খাদ্যের প্রয়োজন কমে যায় এবং দৈহিক পুষ্টি বিধান সহজেই করা যায়।

ভেড়ার খাবারে যেন সমস্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সঠিক অনুপাতে থাকে, যার ফলে প্রজনন হার উন্নততর হয়। পর্যাপ্ত সবুজ ও শুকনো চারার সাথে পশুর আকার ও শরীরের ওজন অনুযায়ী সাধারণভাবে প্রতিদিন ২০০ গ্রাম থেকে ২৫০ গ্রাম ভেড়ার খাদ্য হিসাবে সুপারিশ করা হয়।ভেড়ার খাদ্য উপযুক্ত পুষ্টিকর হতে হবে যাতে তাদের পুষ্টির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।

সাধারণত ভেড়া চারণভূমি থেকে তাদের সমস্ত মৌলিক পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে। সেইজন্যে অনেক ক্ষেত্রেই ভেড়া পালকরা শুধুমাত্র শীতকালে ভেড়ার খাদ্য ক্রয় করে যখন চারণভূমি থেকে প্রয়োজনীয় খাবার পাবার সম্ভবনা কমে যায়। ভেড়ার খাদ্যে ৫ রকম খাবার প্রয়োজন হয় যেমন জল, শক্তি-জাতীয় (কার্বোহাইড্রেট), আমিশ-জাতীয় (প্রোটিন), তেল-জাতীয় (ফ্যাট), ভিটামিন ও খনিজ লবণ। ভেড়ার ক্ষেত্রে খনিজ লবনের মধ্যে কপার সম্মৃদ্ধ খাদ্য প্রদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, পাশাপাশি ভেড়ার জন্য যেসব খনিজ ব্যবহার করা হয়, সেগুলি কপার বিষাক্ততার জন্যও খুব সংবেদনশীল, তাই সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

ভেড়ার খাদ্যে সংযোজিত উপাদান:

ভেড়ার খাদ্যের জন্যে কিছু সাধারণ সংযোজন হল এন্টিবায়োটিক এবং প্রোবায়োটিক। এন্টিবায়োটিক অসুস্থতা এবং রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। এন্টিবায়োটিক গুলোর মধ্যে অন্যতম ব্যবহৃত একটি এন্টিবায়োটিক হল অক্সিটেট্রাসাইক্লিন। এটি রুগ্ন বা গর্ভবতী ভেড়াকে কঠিন রোগের হাত থেকে বাঁচায়। প্রোবায়োটিক হজমে সাহায্য করে ও ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা করে। খাদ্যে সংযোজিত এইসব উপাদান খুবই কার্যকরী যা পেশীর গঠন ও সামগ্রিক চেহারার উন্নতি করে।

গাড়োল বাচ্চার খাবার

জন্মাবার এক ঘন্টার মধ্যে বাচ্চাকে গাঁজলাদুধ (কলোস্ট্রাম) খাওয়াতে হবে এবং তা চলবে টানা পাঁচদিন। জন্মের ৫ দিন পর্যন্ত মা ভেড়া এবং বাচ্চাদের (২-৩) দিন একসাথে রাখতে হয়, যাতে বাচ্চা সঠিক পরিমাণে এবং ঘন ঘন দুধ পেতে পারে। ৫ দিন পর এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত দিনে ২-৩ বার দুধ খাওয়ানো উচিত মেষশাবককে। গাঁজলা দুধের মাধ্যমেই বাচ্চার প্রাথমিক প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, যা বাচ্চাকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে বাচ্চার দৈনিক দুধ খাবার পরিমান তার ওজনের যথাক্রমে ১/৬ অংশ, ১/৮ অংশ, ১/১২ অংশ। তিনমাসের পর আর দুধ খাওয়ানোর দরকার হয় না। একসঙ্গে অনেকগুলি বাচ্চা হলে, মা গাড়োল ভেড়ার দুধ কম হলে বা মা গাড়োল ভেড়া মারা গেলে বাচ্চাদের গরুর দুধও খাওয়ানো যেতে পারে, গরুর দুধও (গাঁজলাদুধ হলে ভালো হয়) বাচ্চাদের জন্য কার্যকর। গ্রীষ্মকালে (৪-৫) ঘন্টার জন্য গাঁজলাদুধ (কোলস্ট্রাম) ঠান্ডা জায়গায় (ফ্রিজে) সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে।

প্রায় ২ সপ্তাহ বয়সে, বাচ্চাদের সবুজ ঘাস খাওয়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। এক মাস বয়সে বাচ্চাদের প্রথম দানা খাবার মিশ্রণ (ক্রীপ ফিডিং) প্রদান করা উচিত। জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অল্প পরিমান দানাখাবার এবং সবুজ ও নরম ঘাস বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে।

ভেড়ার বাচ্চাদের জন্য ক্রীপ ফিডিং:

- ক্রীপ ফিড ২-৩ মাস বয়স পর্যন্ত দেওয়া হয় এবং এক মাস বয়সে শুরু করা যেতে পারে।
- ক্রীপ ফিডিং এর প্রধান উদ্দেশ্য হল তাদের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য আরও পুষ্টি প্রদান করা।
- শারীরবৃত্তীয় অবস্থার ওপর ভিত্তি করে প্রতিদিন বাচ্চা প্রতি (৫০-৮০) গ্রাম ক্রীপ ফিড মেষশাবকদের দেওয়া যেতে পারে।

- এতে কমপক্ষে ২২% প্রোটিন থাকা উচিত।
- রোগজীবাণু থেকে প্রতিরক্ষার জন্য অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা ক্লোরটেট্রাসাইক্লিনের মতো অ্যান্টিবায়োটিক ১৫-২৫ মিলিগ্রাম/কেজি খাদ্যে মেশানো যেতে পারে।

বাচ্চা ভেড়ার সঠিক পুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত ঘাস, পাতা বা বিচালি ছাড়াও বিভিন্ন বয়সের জন্য নিম্নরূপ খাদ্য ও দুধের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

বাচ্চার প্রথম	**কবার খাবার দেবেন**	**মায়ের দুধ**	**ঘাস জাতীয় খাদ্য**	**সুষম খাদ্য / দানা**
১-৭ দিন	মায়ের সঙ্গে থাকবে	মায়ের দুধ ইচ্ছামত		
৮-৪২ দিন	চার বার	৫০ গ্রাম	পর্যাপ্ত পরিমান	৫০ গ্রাম
৪৩-৬০ দিন	তিন বার	৫০ গ্রাম	পর্যাপ্ত পরিমান	৫০ গ্রাম

বাড়ন্ত গাড়োল ভেড়ার খাবার

বাড়ন্ত গাড়োল ভেড়াকে ছেড়ে পালন করলে খাদ্যের অধিকাংশই চড়ে জোগাড় করে নেয়, অল্প পরিমান (গাড়োল ভেড়া পিছু দৈনিক ১০০-১৫০ গ্রাম) অতিরিক্ত দানাখাবার (খাদ্যে শতকরা প্রোটিন- ১৬% - ১৮%) খেতে দিলেই হয়। পর্যাপ্ত চারণভূমি থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দানাখাবার দেবার দরকার হয় না, নিজেদের পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদান চারণভূমি থেকেই সংগ্রহ করে নিতে পারে। চারণভূমিতে প্রতিদিন ৮ ঘন্টা চারণ ভেড়ার স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে সবুজ ঘাস, হে বা খড় এবংদানাখাবার ১০:১০:১ অনুপাতে খাওয়াতে হবে অথবা গাড়োল ভেড়াকে শুধু সবুজ ঘাস খাওয়ালে শুঁটিজাতীয় (বেশি প্রোটিনযুক্ত) ও অশুঁটিজাতীয় (কম প্রোটিনযুক্ত) দুই ধরনের

সবুজ ঘাস ১০:১ অনুপাতে খাওয়ানো যেতে পারে। আবদ্ধ অবস্থায় গাড়োল ভেড়া পালনে বাড়ন্ত গাড়োল ভেড়াকে একসঙ্গে বেশি খাদ্য দিলে দেহে চর্বি জমে যায়, আবার কম দিলে বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না। গ্রীষ্মের মাসগুলিতে রাতে এবং বৃষ্টির দিনে শুকনো পশুখাদ্য দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাড়ন্ত / প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া: দেহের ওজন অনুপাতে ভেড়ার প্রতিদিনের খাবার নিম্নরূপ করা যেতে পারে –

দেহের ওজন (কেজি)	সুষম / দানা খাদ্য (গ্রাম)	সুষম / দানা খাদ্য (কেজি)	জল
৫	৫০	যত খুশি	পর্যাপ্ত
৬	১০০	ঐ	ঐ
৭	১৫০	ঐ	ঐ
৮	১৫০	ঐ	ঐ
৯	২০০	ঐ	ঐ
১০	২০০	ঐ	ঐ
১৫	২৫০	ঐ	ঐ
২০	২৫০	ঐ	ঐ

খারাপ আবহাওয়া যেমন ঝড়, বৃষ্টি বা প্রচন্ড ঠান্ডার দিনগুলিতে ভেড়াকে কখনই চরতে দেওয়া উচিত নয়। এ সময় খামারিকে ভেড়ার পচ্ছন্দসই গাছের পাতা কেটে গুচ্ছ করে ঝুলিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। বাড়ীর রান্নাঘরের উচ্ছিষ্টকেও খাবার হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাড়োল ভেড়ার খাবার

সুস্থ ভেড়ার বাচ্চা পাওয়ার জন্য গর্ভাবস্থায় ভাল খাওয়ানো অত্যন্ত জরুরি। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাড়োল ভেড়াকে ভালো মানের চারণভূমিতে প্রতিদিন ৪-৫ ঘন্টা চড়তে দেওয়া উচিত। খাদ্যের

পরিমান অপর্যাপ্ত হলে দুর্বল ভেড়ার বাচ্চা জন্ম নেবে। সুষম খাদ্যের ব্যবস্থাপনা যেমন দুধের উৎপাদন বাড়ায়, তেমন ল্যাম্বিং প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। গর্ভাবস্থার শেষ দুই মাসে ভ্রূণের বৃদ্ধি ৬০-৮০% বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যে পর্যাপ্ত শক্তির অভাবে গর্ভাবস্থায় নানারকম সমস্যা দেখা যায়, তাই এই সময় গর্ভবতী গাড়োল ভেড়াকে ভাল মানের চারণভূমিতে প্রতিদিন ৪-৫ ঘন্টা চড়তে দেওয়া মা এবং গর্ভস্থ বাচ্চা উভয়ের জন্যই ভীষণ কার্যকরী। শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে গর্ভাবস্থার শেষ দুমাসে অতিরিক্ত দৈনিক (২০০-২৫০) গ্রাম দানাখাবার দিতে হবে এবং শেষ সপ্তাহে তার কিছুটা কমিয়ে সবুজ ঘাসের পরিমান বাড়িয়ে দিতে হবে। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাড়োল ভেড়াকে শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ছাড়াও গর্ভাবস্থা ও দুধ উৎপাদনের জন্য কিছুটা বাড়তি খাদ্য দিতে হয়। দুধের জন্য পালিত গাড়োল ভেড়াকে দুগ্ধবতী অবস্থায় প্রতি কেজি দুধ উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত ৩০০ গ্রাম সুষম দানাখাবার বা ১ কেজি করে পুষ্টিকর সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে। স্তন্যদানকারী ভেড়াকে বাচ্চার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত দুধ উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্য প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে ভেড়াকে দানাখাবারের পরিবর্তে উচ্চমানের শুকনো রুফেজ খাওয়ানো উচিত। প্রসবের পরপরই ভেড়াকে সামান্য গরম জলের সঙ্গে গুড়, গম বা চালের ভুসি বা ভুট্টার মিশ্রণ প্রদান খুবই চমৎকার ফল দেয়। প্রসবের পর ভেড়ার খাদ্য ধীরে ধীরে বাড়ানো হতে পারে যাতে সে দিনে ৬-৭ বার বিভক্ত মাত্রায় সম্পূর্ণ খাদ্য পায়।

দুগ্ধবতী গাড়োল ভেড়াকে প্রতিদিন নিম্নলিখিত অনুপাতে খাদ্য প্রদান করা যেতে পারে--

- ৬-৮ ঘন্টা চারণ + ১০ কেজি সবুজ ঘাস
- ৬-৮ ঘন্টা চারণ + ৪০০ গ্রাম সুষম দানাখাবার
- ৬-৮ ঘন্টা চারণ + ৮০০ গ্রাম ভাল মানের শুটি জাতীয় সবুজ ঘাস

বাড়িতেই দানা বা সুষম খাবার তৈরীর পদ্ধতি:

বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন সংস্থার দানা খাবার পাওয়া যায়। তবে উপাদান জোগাড় করে বাড়িতেই দানা খাবার বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বানানো খাবার সস্তা আবার গুনমানেও ভাল হয়। খাবার বানানোর আগে স্থানীয় সহজ লভ্য উপাদানের মিশ্রন অনুপাত (ভেড়ার প্রকৃতি / বয়স অনুযায়ী) অবশ্যই স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে।

নমুনা দানা / সুষম খাদ্যের বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের শতকরা পরিমান নীচে দেওয়া হল:

উপাদান	বাচ্চা ভেড়া (৬ মাসের নিচে)	বাড়ন্ত ভেড়া (৬ মাস -১৪ মাস)	প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া (১৪ মাসের পর)
ভুট্টা ভাঙা	২২	২০	২৫
ছোলা ভাঙা	২০	৩২	২০
ভুষি/ চুনি	২০	৩০	৩২
বাদাম খোল	৩৫	১৫	২০
খনিজ মিশ্রন	২.৫	২.৫	২.৫
খাদ্য লবন	০.৫	০.৫	০.৫
	১০০	১০০	১০০

প্রজননক্ষম পাঁঠার খাবার

পাঁঠাকে ছেড়ে পালন করলে বা শুধু সবুজ ঘাস খাওয়ালে শুঁটিজাতীয় (বেশি প্রোটিনযুক্ত) ও অশুঁটিজাতীয় (কম প্রোটিনযুক্ত) দুই ধরনের সবুজ ঘাস ১০:১ অনুপাতে এবং ৫০ গ্রাম দানাখাবার

প্রতিদিন খাওয়ানো যেতে পারে। চারণভূমিতে চড়ার ফলে একদিকে যেমন তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে, অন্যদিকে চারণের সময় সুস্থ শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বয়ামও হয়ে যায়। তবে প্রজনন ঋতুতে সবুজ ঘাস ছাড়াও দৈনিক অতিরিক্ত ৩৫০ গ্রাম সুষম দানাখাবার খাওয়াতে হবে।

সারাবছর সবুজ ঘাসের যোগানের জন্য প্রতি ৩৫ টি গাড়োল ভেড়ার জন্য ১ বিঘা জমিতে সবুজ ঘাস চাষ করা যথেষ্ট।

গাড়োল ভেড়ার দানাখাবারের মিশ্রন (শতকরা)

খাদ্যের উপাদান	বাচ্চা গাড়োল ভেড়ার জন্য (কিড স্টাটার)	বাড়ন্ত গাড়োল ভেড়ার জন্য (গ্রোয়ার)	পূর্ণবয়স্ক গাড়োল ভেড়ার জন্য
ভুট্টা ভাঙ্গা	২২	২০	২৫
চাল ভাঙ্গা (ক্ষুদ)	-	-	১৫
গম ভুষি	২০	৩০	২০
ছোলা ভাঙ্গা	১০	১৬	১০
মুগ/মুসুর ভাঙ্গা	১০	১৬	১০
তিল/সরিষা/বাদাম খোল	৩৫	১৫	১৭
ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ	২.৫	২.৫	২.৫
খাদ্য লবণ	০.৫	০.৫	০.৫
	১০০	১০০	১০০

মনে রাখা ভাল -

ভূট্টার পরিবর্তে খুদ, গম, বা মাইলো স্থানীয়ভাবে যে খাদ্য উপকরণটি সহজলভ্য তা ব্যবহার করা যেতে পারে। ছোলর পরিবের্ত মুগ, মুসুর বা অড়হড় ব্যবহার করা যায়।

ভেড়ার সঠিক দৈহিক বৃদ্ধি ও বংশবিস্তারের জন্য খাদ্য তালিকায় খনিজ মিশ্রন (Mineral Mixture) খুবই প্রয়োজনীয়। বাজারে বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থার খনিজ মিশ্রন পাওয়া যায়। স্থানীয় পশু চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে কিছু পরিমান খনিজ মিশ্রন দেওয়া হয়।

ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে ভুসি অত্যাধিক পরিমানে খাওয়ানো উচিত নয়। ভূষিতে অক্সালেট বেশি থাকার জন্য ভেড়ার শরীরের ক্ষতি হয়- কিডনি বা মুত্রথলি / মুত্রনালীতে পাথর জন্মায়।

ভেড়ার পচ্ছন্দের কিছু তন্তু জাতীয় খাদ্য বা রাফেজেস এর তালিকা নীচে দেওয়া হল। ভেড়াপালক সুবিধামত এগুলি বাসস্থানের আসপাশে চাষ বা রোপন করতে পারেন।

ক) গাছের পাতাঃ বাবলা, নিম, কাঁঠাল, সুবাবুল, অশোক, পিপুল, বট, অশ্বত্থ, তুঁত বা মালবেরী।

খ) ঝোপ বা গুল্ম জাতীয় গাছের পাতা: কুল, করঞ্চা, জবা, পুনরভা ইত্যাদি।

গ) সব্জি: গাজর, বীট, মূলো, ফুলকপি, বাঁধাকপি এবং পালং।

ঘ) চাষযুক্ত সবুজ ঘাস:

শিম্বগোত্রীয়- বারসীম, লুসান, মটর ও বীমস্

অশিম্বগোত্রীয়- ভুট্টা, গামা, প্যারা, নেপিয়ার

ঙ) অ্যাজোলা বা হাইড্রোপনিকঃ চাষের জমি না থাকলে এই পদ্ধতিতে ঘরেই কিছু পরিমান সবুজ ঘাস উৎপন্ন করা যায়।

চাষের জন্য ঘাসের দানা / বীজ বাজারে স্বল্পমূল্যে কিনতে পাওয়া যায়। নিয়মিত যোগাযোগ রাখলে স্থানীয় পশু চিকিৎসা কেন্দ্র/ বিএলডিও অফিস থেকেও এগুলি বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

ঘাস বা পতিত জায়গায় দল/গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে সামাজিক ঘাস উৎপাদন (Community Fodder Field) তৈরী করে ভেড়ার পছন্দের ঘাস চাষ করা যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিএলডিও অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

চ) সাধারণ ঘাস: দূর্বা, মোথা, অঞ্জন, সেনজি, স্টইলো

ছ) হে বা শুকনো ঘাস, খড় ও বিচালি: জইয়ের হে, বাদামহে, বীমের খড়, গামের খড়। পরিপক্ক ঘাস সবুজ অবস্থায়কেটে এনে হালকা রোদে শুকিয়ে করা হয়। বস্তাবন্দি করে ঘরে হে জমিয়ে রাখা যায়। অসময়ে যেমন ঝড় বৃষ্টির দিনে যখড় ভেড়া বাইরে চরান যায় না তখন খাবার হিসাবে হে ব্যবহার করা যায়।

জ) ভেড়ার উপযোগী কিছু দানা জাতীয় খাদ্য বা কনসেনট্রেট সম্বন্ধে ধারণা রাখা দরকার।

১) আমিষ সরবরাহকারী: (Protein rich) বিভিন্ন প্রকার খোল যেমন সরিষা, তিল, বাদাম বা নারিকেল।

২) শক্তি সরবরাহকারী (Energy /Carbohydrate rich): বিভিন্ন প্রকার দানাশস্য যেমন চাল, খুদ, গম, যব ও ভুট্টা।

গ) কৃষি উপজাত দ্রব্য (Agri by Products): বিভিন্ন প্রকার চুনি যেমন মুগ, মুসুর, মটর বা অড়হর, ধান বা গমের ভূষি এবং ঝোলা গুড়।

গাঁজলা দুধ খাওয়ানো (Colostrum Feeding):

জন্মগ্রহনের ১৫-৩০ মিনিটের মধ্যে বাচ্চাকে গাঁজলা দুধ বা কোলোস্ট্রাম খাওয়াতে হবে এবং তা চলবে কমপক্ষে পরবর্তী ৩-৪ দিন পর্যন্ত। এটি বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, শক্তি সরবরাহ করে এবং শরীর গরম রাখে। গাঁজলা দুধ না পেলে সেই বাচ্চা পরবর্তীকালে খুবই রুগ্ন ও দুর্বল হয়।

বিশেষ খাবার খাওয়ানো (ফ্লাশিং):

প্রজনন ঋতু শুরুর দুই-তিন সপ্তাহ আগে প্রজনন যোগ্য স্ত্রী ভেড়াকে কিছুকাল উন্নতমানের সবুজ ঘাস এবং প্রতিদিন ২০০-২৫০ গ্রাম দানা খাওয়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে গর্ভবতী ভেড়ার স্বাস্থ্য যেমন খুব ভালো থাকে তেমনই উন্নত মানের সুস্থ দুই বা ততোধিক বাচ্চা জন্মানোর সম্ভবনা বৃদ্ধি পায়।

মুখের চোয়ালের বিশেষ গঠনের জন্য অন্যান্য গবাদি পশুর চরে খাওয়া চারনভূমি থেকেও ভেড়ারা প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। আবার ছাগল যেমন গাছের অগ্রভাগ খেয়ে ফসলের ক্ষতি করে ভেড়ার খাদ্যাবাস ঠিক বিপরীত হওয়ার ফসলের ক্ষতি হয় না।

কিছু প্রচলিত সবুজ ঘাসের চাষ

১) হাইব্রিড নেপিয়ার ঘাস

হাইব্রিড নেপিয়ার ঘাস

চাষের সময় - মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য অক্টোবর।

পদ্ধতি - কাটিং ২-৩ চোখযুক্ত কাটিং সারিবদ্ধ ভাবে ২ ফুট অন্তর লাগাতে হবে, কাঠা প্রতি - ২৬০-২৬৫ কাটিং লাগবে।

জমি তৈরী - আগাছা মুক্ত, সেচ দেবার পর ৮৫ কেজি প্রতি কাঠা হিসাবে গোবর সার লাগবে।

ফসল কাটা - লাগানোর ২ মাস পর থেকে শুরু করে বছরে ৬-৮ বার দেড় মাস অন্তর কাটা যায়। প্রতিবার কাটার পর চাপান সার হিসেবে কাঠা প্রতি ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া দিতে হবে। প্রতি কাঠা জমিতে বছরে ২০০০ কেজি পশুখাদ্য উৎপাদন করা যায়। এনবি-৩, এনবি-৮, এনবি-২১ পুষ্টিযুক্ত প্রোটিন ৯.৪% ।

২) প্যারা ঘাস

চাষের সময় - মধ্য জুন থেকে মধ্য অগাস্ট

প্যারা ঘাস

জমি - জলা জমি দরকার

চাষের পদ্ধতি - কাঠা প্রতি বীজ ৮০-১০০ গ্রাম, ২০০-২৫০ টি কাটিং লাগবে, প্রতি সারির মধ্যে ২ ফুট ও প্রতি কাটিংয়ের মধ্যে ৬ ইঞ্চি দূরত্ব থাকবে।

ফসল কাটা - লাগানোর ৩ মাস পর থেকে ফসল কাটা যায়। কাটার পর চাপান সার হিসেবে ইউরিয়া দিতে হবে।

ফলন - কাঠা প্রতি ৭০০-৮০০ কেজি

পুষ্টিগুণ - প্রোটিন ১০%

৩) গিনি ঘাস

চাষের সময় - শীত ছাড়া বছরের যে কোনো সময়, বর্ষার শুরুতে (জুন মাস) হলে ভালো হয়।

গিনি ঘাস

জমি - জলা জমি ছাড়া যে কোন জমিতে চাষ করা যেতে পারে।

চাষের পদ্ধতি - কাঠা প্রতি ৫৩০-৫৩৫ কাটিং বা ৩০ গ্রাম বীজ লাগবে।

ফসল কাটার সময় - লাগানোর ২ মাস পর থেকে কাটা যায় ও বছরে সেটা ৬-৭ বার হতে পারে। কাটার পর চাপান সার হিসেবে ইউরিয়া দিতে হবে। কাঠা প্রতি ৩.৬ কুইন্টাল পশুখাদ্য পাওয়া যায়।

পুষ্টিগুণ - প্রোটিন (৮-৯) %

৪) স্টাইলো ঘাস

চাষের সময় - সারা বছর

জমি - জলা জমি ছাড়া যে কোন জমি।

চাষের পদ্ধতি - কাঠা প্রতি ৫০ গ্রাম বীজ লাগবে।

স্টাইলো ঘাস

কাটার সময় - লাগানোর ৩ মাস পর থেকে ৪৫ দিন অন্তর কাটা যায়। প্রতি কাঠায় ২ কুইন্টাল পশুখাদ্য পাওয়া যায়।

পুষ্টিগুণ – ২০ %

৫) বারসীম

চাষের সময়- অক্টোবর- নভেম্বর।

জমি - দোআঁশ মাটিতে ভালো চাষ হয়।

চাষের পদ্ধতি - কাঠাপ্রতি ১৫০ গ্রাম বীজ দরকার।

বারসীম

কাটার সময় - লাগানোর ২ মাস পর থেকে বছরে ৩-৪ বার ফসল কাটা যায়।

পুষ্টিগুণ - প্রোটিন (১৮-২০) %

উন্নত জাত - মাস্কাভি, বটন, বএলি-১

৬) লুসার্ন

লুসার্ন

চাষের সময়- অক্টোবর- নভেম্বর।

জমি - দোআঁশ মাটি ।

চাষের পদ্ধতি - কাঠাপ্রতি ১৫০ গ্রাম বীজ দরকার।

কাটার সময় - লাগানোর ২ মাস পর থেকে যে জমিতে আগে লুসার্ন চাষ হয়েছে, সেই জমির মাটি দিতে হবে। ১০ ইঞ্চি সারিতে বোনা যায়।

পুষ্টিগুণ - প্রোটিন (১৮-২০) %

উন্নত জাত - টি-৯

৭) ভুট্টা

ভুট্টা

চাষের সময় - সারা বছর।

জমি - দোআঁশ মাটি।

চাষের পদ্ধতি - কাঠা প্রতি ৫০০ বীজ লাগবে।

ফসল কাটার সময় - লাগানোর ২ মাস পর থেকে কাটা যায় এবং ৬-৮ সপ্তাহ অন্তর কাটা যায়।

পুষ্টিগুণ - প্রোটিন (৬-৮) %

উন্নত জাত - আফ্রিকানটল, জ-১০০৬, জ-১০০৭, গঙ্গা-৫

৮) জোয়ার

চাষের সময় - মে থেকে জুন মাস।

জমি - দোআঁশ মাটি।

চাষের পদ্ধতি - কাঠা প্রতি ৩৫০ গ্রাম বীজ লাগাতে হবে।

জোয়ার

ফসল কাটার সময় - লাগানোর ২ মাস পর থেকে কাটা যায় এবং ৬-৮ সপ্তাহ অন্তর কাটা যায়।

পুষ্টিগুণ - প্রোটিন (৬-৮) % ।

উন্নত জাত - ১, ৬, ৯ এইচ সি - ১৩৬, এমপিচেরি

৯) ওটস

চাষের সময় - অক্টোবর থেকে নভেম্বর।

জমি - দোআঁশ মাটি।

চাষের পদ্ধতি - কাঠা প্রতি ৫০০ গ্রাম বীজ লাগবে। বপনের আগে ৪ ঘন্টা বীজ জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। কাঠা প্রতি ১০ কেজি গোবর সার লাগবে।

ওটস

ফসল কাটার সময় - বীজ বোনার ৪০ দিন পর প্রথম কাটিং পাওয়া যায়। তারপর প্রতি ৩০ দিন অন্তর কাটিং পাওয়া যায়। বছরে ৭ বার কাটা যায় ও বছরে ৪ কুইন্টাল পশুখাদ্য পাওয়া যায়।

পুষ্টিগুণ - প্রোটিন (৭-৮) %

উন্নত জাত - কেন্ট, জএইচও-৮২২, জএইচও-১১-১

১০) বরবটি

চাষের সময়- মার্চ থেকে জুলাই।

জমি - দোয়াঁশ মাটি।

চাষের পদ্ধতি - কাঠা প্রতি ২৬০ গ্রাম বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে। কাঠা প্রতি ৬০ কেজি গোবর সার ও ২ কেজি সুপার ফসফেট ও ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে সার দিতে হবে।

বরবটি

ফসল কাটার সময় - বোনার ৭০ দিন পর ফুল আসার আগে কাটা যায়। বছরে ৫ কুইন্টাল সবুজ পশুখাদ্য পাওয়া যায়।

পুষ্টিগুণ - প্রোটিন (১১-১৩) %

উন্নত জাত - রান্দিয়ান, কে -৩১৭

সহজলভ্য কিছু অপ্রচলিত পশুখাদ্য

গাছের পাতা:

যেহেতু গাছের পাতায় খাদ্যগুন বেশী থাকে সেহেতু অন্যান্য পশুখাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে পশুকে খাওয়ালে অল্পখরচে উত্তম পশুখাদ্য পাওয়া সম্ভব। যেমন - বাঁশপাতা (ডিসিপি - ৯.৩%, টিডিএন - ৪৮.৯%), সুবাবুল পাতা (ডিসিপি - ১২.৬%, টিডিএন - ৭০%), তুঁত পাতা (ডিসিপি - ৭-৮%, টিডিএন - ৪৮.৩%), ইত্যাদি।

গমের বিচালি:

গমের বিচালিকে মেশিনের সাহায্যে গুঁড়ো করে, ইউরিয়া ও ঝোলাগুড় মিশিয়ে উৎকৃষ্ট মানের পশুখাদ্য তৈরী হয় ও তা ব্যবহার করলে খাদ্যের গুনাগুন বাড়বে।

পাট ও শন

মিষ্টি পাট পাতা (ডিসিপি -১৩.৮%, টিডিএন -৬০.৬%) এবং **শন** (ডিসিপি -১৮.৭%, টিডিএন -৬৫%), অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সঙ্গে প্রয়োজন মতন মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। তবে বেশী খাওয়ালে পাতলা পায়খানা হতে পারে।

পাট

শন

কচুরিপানা

কচুরি পানাকে রোদে শুকিয়ে ছোট ছোট করে কুঁচি তৈরী করে খোল ও খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। কচুরিপানা ও খড় ৪:১ অনুপাতে মিশিয়ে ২% লবন দিয়ে সাইলেজ তৈরী করেও খাওয়ানো যেতে পারে।

কচুরিপানা

কলাপাতা, সুবাবুল ও বাবলাপাতা

অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে যেতে পারে।

কলাপাতা বাবলাপাতা সুবাবুল

আজোলা

আজোলা

আজোলা চাষের জায়গা

এটি একটি জলজ ভাসমান ফার্ন ও এতে ১৫-৩০% প্রোটিন থাকে, তাছাড়া থাকে খনিজ লবণ। এটি একটি উৎকৃষ্ট সবুজ প্রাণীখাদ্য।

চাষের সময় - সারা বছর।

প্রথমে ছায়া জায়গায় গর্ত (৫ ফুট x ৩.৫ ফুট x ১ ফুট) বানাতে হবে। গর্তটিকে মোটা প্লাস্টিক (১০ ফুট x ৭ ফুট) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে জল ধারণ করতে পারে। প্লাস্টিকের চারপাশ মাটি দিয়ে আটকে দিতে পারে। তার উপর ১০ কেজি গুড় মাটি এবং ২ কেজি গোবরসার ও ৫০০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট ছড়িয়ে দিতে হবে। ১ সপ্তাহ পর ওই জলের উপর ম্যাট আকৃতির আজোলা চাদর তৈরী হবে।

আজোলা সংগ্রহের পদ্ধতি:

চাষের ১০-১৫ দিন পর থেকে প্রতিদিন ৫০০-৬০০ গ্রাম আজোলা পাওয়া যায়। প্রতি মাসে ঐ গর্তের জল পাল্টিয়ে নতুন জল দিতে হবে।

খাওয়ানোর পদ্ধতি:

গর্ত থেকে ভালোভাবে জলে ধুয়ে নিতে হবে যাতে গোবরের গন্ধ না থাকে। তারপর রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। অন্যান্য খাদ্য উপাদান ও ঝোলা গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণীকে খাওয়ানো যায়।

পাঁচটি ভেড়া নিয়ে সারা বছরের সবুজ ঘাসের/খাদ্যের যোগান

- ভেড়ার সংখ্যা – ৫ টি,
- শুষ্ক পদার্থের প্রয়োজন দেহের ওজনের শতকরা ৩ ভাগ (শুধুমাত্র মাংসের জন্য পালিত ভেড়ার ক্ষেত্রে)
- ধরা যাক, প্রতিটি ভেড়ার ওজন ১০ কেজি করে,
- সবুজ প্রাণীখাদ্য থেকে প্রাপ্ত শুষ্ক পদার্থ ১০% ধরে,

তিটি ভেড়া পিছু সবুজ প্রাণীখাদ্যের প্রয়োজন ৩ কেজি,

ফলে ৫ টি ভেড়ার জন্য প্রয়োজন (৩ x ৫) = ১৫ কেজি প্রতিদিন,

- সারা বছরের জন্য সবুজ ঘাসের প্রয়োজন (১৫ x ৩৬৫) = ৫৪৭৫ কেজি,

সারা বছরে ৫ টি ভেড়ার জন্য সবুজ খাদ্য একটি ৫ কাঠা জমিতে নিম্নরূপে চাষ করা যেতে পারে,

জমির পরিমাণ	সবুজ গো-খাদ্য	উৎপাদন/ বছরে
২ কাঠা	হাইব্রিড নেপিয়ার	২,০০০ কেজি (৭-৮ বার কাটিং)
১ কাঠা	জোয়ার	১,৫০০ কেজি
১ কাঠা	ভুট্টা	১,৫০০ কেজি
১ কাঠা	বরবটি + গাইমুগ/ভুট্টা*	৫০০ কেজি + ১,৫০০ কেজি*
মোট ৫ কাঠা		৫,৫০০ কেজি + ১,৫০০ কেজি*

হাইব্রিড নেপিয়ার, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, যব, বরবটি, বারসীম, লুসার্ন

- এর সাথে কাঁঠাল পাতা, সুবাবুল পাতা দেওয়া যেতে পারে, যা ভেড়া খুবই ভালো খায়। কিন্তু সুবাবুল পাতা মোট খাবারের ৩ ভাগের বেশী দেওয়া উচিত নয়।

- শুঁটি জাতীয় খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী থাকে, যেমন বরবটি, বারসীম, লুসার্ন ইত্যাদি।

- অ্যাজোলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে, ফলে সুষম দানা খাবার কম লাগে।

- সময়মত ফসল কাটা খুবই জরুরী, কারণ বেশী বয়সের কাটা ফসলের গ্রহণ যোগ্যতা কম ও তাতে খাদ্যের গুনগত মান কমে যায়।

- ভেড়াকে ছোট ছোট করে কেটে খড় খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে।

- রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গাতেই নিবিড় চাষ হওয়ার ফলে চারণ ভূমির অভাব আছে, তাই ঘাস কেটে এনে বাড়িতে খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে।

- সবুজ ঘাস কেটে এনে ব্যাগে ঝুলিয়ে খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে, বর্ষাকালে এর সুফল পাওয়া যাবে।

- উঠোনের কোণ, পুকুর পাড় ইত্যাদি এলাকাকে বেশী ভেড়া পালনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে,

বিভিন্ন ওজন ও বয়সের ভেড়াকে কি কি খাবার দিতে হবে-

আনুমানিক বয়স	দেহের ওজন (কেজি)	ভেড়ার দুধ (গ্রাম/ প্রতিদিন) সকাল-সন্ধ্যা মিলিয়ে	সবুজ ঘাস (কেজি/প্রতি দিন)	সুষম খাদ্য (গ্রাম/ প্রতিদিন)
২ মাস	২	২০০	---	---
৩ মাস	৩	২৫০	---	---
৪ মাস	৪	৩০০	পর্যাপ্ত পরিমাণ	৫০
৫ মাস	৫	--- ---	১.৫	৬০
৬ মাস	৬	--- ---	১.৮	৭০
৭ মাস	৭	--- ---	২.১	৮০
৮মাস	৮	--- ---	২.৪	৯০
৯ মাস	৯	--- ---	২.৭	১০০
১০ মাস	১০	--- ---	৩.০	১০০
১৮ মাস	১৫	--- ---	৪.৫	১০০
২ বছর	২০	--- ---	৬.০	১০০

সবুজ-ঘাস চাষের বর্ষচক্র

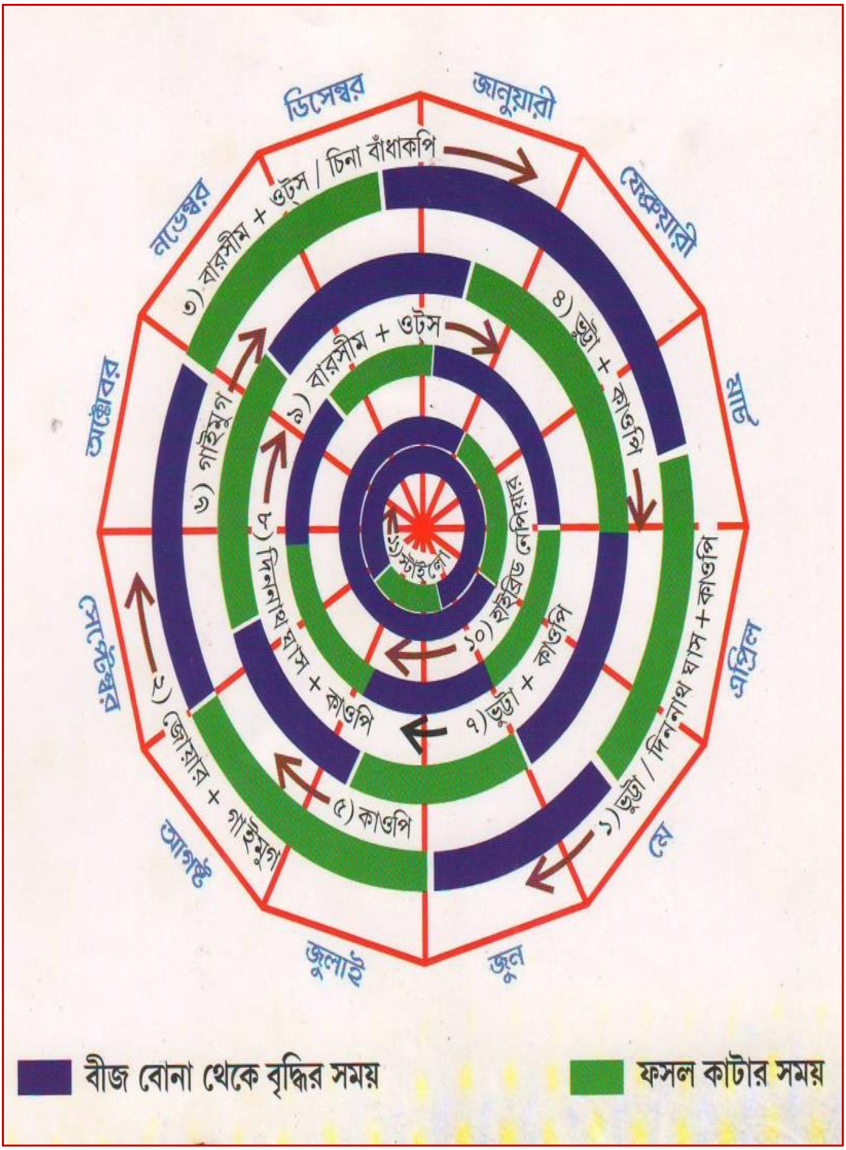

গাড়োল ভেড়ার প্রজনন

প্রজনন ক্রিয়া একটি জটীল শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। যদিও প্রজননগত সমস্যা গাড়োল ভেড়ার ক্ষেত্রে কম দেখা যায় তবুও গাড়োল ভেড়া পালনে লাভের জন্য গাড়োল ভেড়া প্রজনন সম্পর্কিত অল্প-বিস্তর জ্ঞান থাকা দরকার। পরিণত বয়সের স্ত্রী গাড়োল ভেড়ার গরম না হওয়া, ঋতুর লক্ষন না দেখানো, বারবার গরম হওয়া, গর্ভপাত, বাচ্চা যোনিদ্বারে আটকে যাওয়া, প্রসবের পর ফুল শরীরের মধ্যে থেকে যাওয়া ইত্যাদি খুবই সাধারন সমস্যা দেখা যায় গাড়োল ভেড়া পালনের ক্ষেত্রে। ভারতবর্ষ তো বটেই, সারা পৃথিবীতে ভেড়ার যে প্রায় ৮৫০ টি ভেড়ার প্রজাতি আছে - তাদের মধ্যে বাচ্চা উৎপাদনের হার সবচেয়ে বেশী সুন্দরবনের গাড়োল প্রজাতির ভেড়ার। এই প্রজাতির স্ত্রী ভেড়া অল্প বয়সে (১০-১২ মাস বয়সে) গাভীন হয়ে যায় এবং তারপর বছরে ২ বার করে বাচ্চা দেয়। প্রতিবার ২/৩/৪ টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে এটি প্রমানিত যে পৃথিবীখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান মেরিনো প্রজাতির ভেড়ার বেশী বাচ্চা উৎপাদনের মূলে আছে সুন্দরবনের গাড়োল ভেড়ার জেনেটিক বৈশিষ্ট্য। সঠিক প্রজনন পদ্ধতি মেনে চলার উপর ভেড়ার চাষের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে। উন্নতমানের পুরুষ ও স্ত্রী ভেড়া চিহ্নিত করার পর তাদের মধ্যে প্রজননঘটিয়ে বংশবৃদ্ধি করা দরকার।

১. প্রজননক্ষম হওয়ার বয়সঃ ৮ মাস (স্ত্রী), ১২ মাস (পুরুষ)

২. প্রজনন করানোর উপযুক্ত বয়সঃ ১০-১২ মাস (স্ত্রী), ১৮-২০ মাস (পুরুষ) (তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ওজন, পরিনত গাড়োল ভেড়ার ওজনের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশের অধিক হতে হবে)

৩. গরম হবার অন্তর্বর্তী কালঃ ১৮-২১ দিন

৪. গরম থাকার সময়ঃ ২৪-৩৬ ঘন্টা

৫. প্রজননের উপযুক্ত সময়ঃ গরম হবার লক্ষন প্রকাশের ১৬ ঘন্টা পর থেকে ৩০ ঘন্টার মধ্যে।

৬. গর্ভধারনকালঃ (১৪২-১৫৫) দিন (গাড়োল ভেড়ার প্রজাতি, ওজন, বয়স, খাবার, প্রজননের মাস প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে)

৭. দুটি বাচ্চা প্রসবের আদর্শ অন্তর্বর্তী ব্যবধানঃ (২০০-২২০) দিন

৮. বাচ্চা প্রসবের পর পুনরায় গরম হবার সময়ঃ ২ মাস

৯. একটি গাড়োল ভেড়ার প্রসবের সময় একইসঙ্গে একটি সন্তান প্রসবের হার (৭-৪০) %, যমজ সন্তান প্রসবের হার (৫০-৬৫)%, তিনটি সন্তান প্রসবের হার (৫-২৫)% এবং চারটি সন্তান প্রসবের হার হলো (০.৫-৫)% এবং স্ত্রী ভেড়ার গড় প্রসবের হার (১.৫-২.৫)।

১০. পুরুষ ভেড়ার প্রতিবার স্খলনে বীর্যপাতের পরিমাণ (০.৩-১) মিলিলিটার, বীর্যের pH (৬.৫-৭.০) এর মধ্যে থাকে এবং গড়ে শুক্রাণুর সংখ্যা (২১০০-৫৫০০) মিলিয়ন/মিলি।

১১. খাসিকরনের উপযুক্ত বয়সঃ ২ মাস (এর ফলে দৈহিক বৃদ্ধিহার বাড়ে, মাংস সুস্বাদু হয়, চামড়ার গুনমান উন্নত হয়, বারডিজো যন্ত্রের মাধ্যমে রক্তপাতহীন খাসিকরন করাই ভালো)

১২. বাচ্চা বাজারজাত করার উপযুক্ত বয়সঃ ৮-১০ মাস

১৩. গাড়োল ভেড়া প্রজননক্ষম থাকে- ৬ বছর (স্ত্রী), ৭ বছর (পুরুষ)

১৪. সপ্তাহে ২ দিন পাল ধরানো যায় এবং দুটি পালের মধ্যে ব্যবধান হওয়া উচিত গড়ে ৩ দিন ছাড়া।

গাড়োল ভেড়ার গরম হবার লক্ষন

লক্ষ্য করা গেছে গাড়োল ভেড়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী ভেড়া বছরে দুটি সময় মার্চ-এপ্রিল এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বেশী গরম হয়। গাড়োল ভেড়ার গরম হবার লক্ষনগুলি নিম্নরূপ--

- চঞ্চল হয়ে পড়ে।
- ঘন ঘন প্রসাব করে।
- বারবার ডেকে উঠে (আওয়াজ করে) ।
- খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয়।
- যোনিদ্বার লাল হয়ে যায় ও ফুলে উঠে।
- যোনিদ্বার দিয়ে স্বচ্ছ নারকেল তেলের মত স্রাব বের হয়।
- বারবার লেজ নাড়তে থাকে।
- অন্য গাড়োল ভেড়ার ওপর ওঠার চেষ্টা করে।
- পুরুষ গাড়োল ভেড়া সামনে এলে শান্ত হয়ে দাড়িয়ে থাকে।
- দুধ দেওয়া গাড়োল ভেড়া হলে দুধ উৎপাদন কমে যায়।

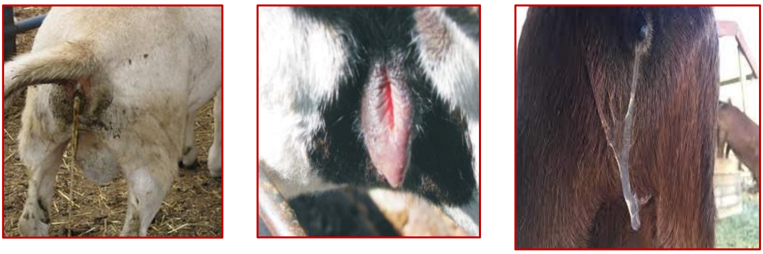

গাড়োল ভেড়ার গরম হবার কিছু লক্ষন

গর্ভাবস্থার সতর্কতা

- পাল ধরানোর তারিখ লিখে রাখতে হবে। গাড়োল ভেড়ার বাসস্থান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও বায়ু চলাচল যুক্ত হতে হবে এবং পায়চারীর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে।

- গর্ভাবস্থার ৩ মাসে পেটের ওপর হাত রাখলে বাচ্চা নড়াচড়া অনুমান করা যায়। তবে খুব বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিৎ নয়।

- প্রসবের দুমাস আগে থেকে দুধ দোয়া বন্ধ করতে হবে।

- প্রসবের দুসপ্তাহ আগে গর্ভবতী গাড়োল ভেড়াকে আলাদা রাখতে হবে।

- গর্ভবতী গাড়োল ভেড়ার ঘরে খড় বা বস্তা বিছিয়ে নরম বিছানা তৈরী করতে হবে।

- গর্ভাবস্থার শেষ দুসপ্তাহে পর্যাপ্ত জল ও উন্নত মানের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

- গর্ভাবস্থার প্রথম ২০ থেকে ৬০ দিন এবং প্রসবের শেষ দুসপ্তাহ আগে কৃমির ওষুধ না খাওয়ানো ভালো এবং গাড়োল ভেড়াকে কম ঘাঁটাঘাঁটি করা ভালো।

গর্ভবতী ভেড়া

প্রসবের পূর্ব মুহূর্তের লক্ষন

- অন্যান্য গাড়োল ভেড়াদের থেকে আলাদা থাকার চেষ্টা করে এবং সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে থাকে।

- অস্থির হয়ে উঠে, দাঁত চিবোয়, খেতে চায় না।

- অনেকসময় শরীরের পিছনের অংশ চাঁটতে থাকে।

- পালান দুধে ভরে যায়, অনেকসময় বাঁট থেকে দুধ পরে।

- যোনিমুখের চারিপাশ ফুলে যায় এবং সরু দড়ির মত সাদা স্রাব পড়ে।
- প্রসবের ঠিক আগেই চঞ্চল হয়ে উঠে এবং জোরে জোরে ডাকে।

ভেড়ার বাচ্চা প্রসবের পূর্ব মুহূর্তের কিছু লক্ষন

প্রসবকালীন লক্ষন

- চঞ্চল হয়ে যায় এবং ঘন ঘন জোরে জোরে ডাকে।
- চোখের সাদা অংশটা লাল হয়ে যায়।
- পেটে সংকোচন করতে থাকে।
- প্রসব যন্ত্রণায় পিছনের পা দুটো মাটিতে মারে এবং বারবার উঠবস করতে থাকে।
- জল্‌ভর্তি থলি যোনিদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে।

ভেড়ার প্রসবকালীন লক্ষন

প্রসবের সময় এবং সদ্যজাত বাচ্চার প্রতি করনীয়

১. প্রসব বেদনা শুরু হবার ২ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চা প্রসব করে।

২. প্রসবের সময় গর্ভবতী গাড়োল ভেড়াকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, খোলামেলা জায়গায় আলাদাভাবে রাখতে হবে।

৩. নাড়ীর দুপাশ বাঁধন দিয়ে মাঝখানে কাটতে হবে এবং দিনে দুবার টানা (৫-৭) দিন জীবানুনাশক পদার্থ যেমন টিংচার আয়োডিন বা মারকিউরোক্রোম ২% লাগিয়ে দিতে হবে, যাতে কোন সংক্রমণ না হয়।

৪. বাচ্চা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে নাক, মুখ পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৫. জন্মাবার পর বাচ্চাকে মায়ের কাছে দিলে মা জীভ দিয়ে চেটে দিলে বাচ্চা তাড়াতাড়ি নিজের থেকে উঠে দাঁড়ায়, যদি বাচ্চা দুর্বল হয় তাহলে তাকে মায়ের বাঁটের কছে পৌঁছে দিতে হবে এবং মুখটা বারবার বাঁটের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে।

৬. বাচ্চা যোনিদ্বারে আটকে গেলে দ্রুত প্রানী চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৭. জন্মাবার প্রথম ৫ দিন বাচ্চার দেহের ওজনের ১/১০ ভাগ গাঁজলা দুধ দিনে ৪-৫ বারে খাওয়ানো উচিৎ। গাঁজলা দুধে সাধারন দুধের থেকে ১০০ গুন বেশী অ্যান্টিবডি থাকে, যা বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অবশ্য বেশী পরিমান গাঁজলা দুধ খেলে বাচ্চা পাতলা পায়খানা করতে থাকে। যদি ২টির বেশী বাচ্চা হয়, সেই সময় দুর্বল বাচ্চাটিকে নিজের হাতে আগে মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। যদি পর্যাপ্ত দুধ মায়ের না থাকে তবে Milk Replacer দুর্বল বাচ্চাটিকে খাওয়াতে হবে।

সদ্যজাত বাচ্চাসহ গাড়োল ভেড়া

মাতৃদুগ্ধ প্রতিস্থাপক (Milk Replacer)

	উপাদান	অনুপাত
১.	চাল, গম, ভুট্টার গুঁড়ো	২০%
২.	গুঁড়ো দুধ (Skimmed Milk Powder)	৭০%
৩.	ক্যালসিয়াম ফসফেট (শুকনো)	১.৫%
৪.	ভিটামিন এবং খনিজ লবণ মিশ্রণ	০.৫%
৫.	সাধারণ লবন	১.৫%
৬.	সয়াবিন তেল	৬.৫%
৭.	জল (উষ্ণ গরম)	১০০ মিলিলিটার

৮. বাচ্চাকে অন্তত ৫দিন প্রতিদিন একটি করে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ট্যাবলেট খাওয়ালে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে।

৯. বাচ্চা বেরোনোর পর ফুল পড়েছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে (প্রসব বেদনা শুরু হওয়া থেকে ফুল পড়া পর্যন্ত প্রায় ৫-১০ ঘন্টা লাগে। প্রসবের ১২ ঘন্টার মধ্যে ফুল না পড়লে ডাক্তারবাবুর সাহায্য নিতে হবে।

১০. যে ভেড়ার ৩ টির বেশী বাচ্চা হয়েছে, তাঁর পাঁঠাগুলিকে খাসীকরণ না করা হয়। ভবিষ্যতে প্রজননের কাজে এগুলোর ব্যবহার করতে হবে।

প্রজননের জন্য পুরুষ ভেড়া নির্বাচন

পুরুষ ভেড়া কেনার বা বাছাই এর সময় প্রতি বিয়ানে কটি করে বাচ্চা দিয়েছে, প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় গুনাগুন আছে কিনা এসব দেখতে হবে। সুস্থ, সবল, বলিষ্ট চেহারা, বুকের খাঁচা বেশ চওড়া এসব দেখে পুরুষ ভেড়া প্রজননের জন্য নির্বাচন করা উচিত। ১২ মাসের পুরুষ ভেড়ার লম্বাটে গড়ন ও ওজন ১৩-১৪ কেজি হওয়া চাই। ১ বছরের কম বয়সী পুরুষ ভেড়া প্রজননের উপযুক্ত নয়। ২০ টি স্ত্রী ভেড়া পিছু ১ টি পুরুষ ভেড়া দরকার।

পুরুষ ভেড়ার প্রজনন ক্ষমতা নির্ভর করে মূলত – পুষ্টি, জাত, ঋতুচক্র, পরিচর্যা ও রোগজ্বালার উপর। সাধারণভাবে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন বডি কন্ডিশন স্কোর (BCS), দৈহিক গঠন (পুরুষালী ভাব), রোগাক্রান্ত হওয়ার তথ্য, পাঁঠার গন্ধ ইত্যাদি দেখা দরকার।

সুস্বাস্থ্য ও সুগঠিত, শক্ত ও দৃঢ় আঘাত হীন পা, বড় আকৃতির পাঁঠা, চওড়া কাঁধ ও সরু কোমর অর্থাৎ সামনের দিক ভারি এবং পিছনের দিক হালকা, এমন পাঁঠা ভাল। চকচকে ত্বক ও ঘাড়ে কেশর যুক্ত (প্রজননের সময় খাড়া হয়), দাড়িওয়ালা, শক্তিশালী ও চনমনে পাঁঠা। পুষ্ট দুটি অণ্ডকোষ, একই আকৃতির ও আকারের হওয়া চায়। সমানমাপের অণ্ডকোষ ৪ ইঞ্চির মত বড়, উলম্বভাবে ঝোলা অবস্থায় থাকবে।

জন্মের সময় ২ কেজির বেশী ওজন ওয়ালা পাঁঠা ভালো। ৬ বছরের বেশী বয়সের পাঁঠা ব্যবহার না করাই ভালো। পেলভিক হাড়ের অন্তর্বর্তী ব্যবধান ৪.৫ থেকে ৫ ইঞ্চি হলে সেই পাঁঠা বেশী প্রজননক্ষম হয়।

৩ মাস বয়সেই সুস্থ, সবল ও ভালো চেহারার পুরুষ ভেড়া বাচ্চাকে বাছাই করতে হয়।

প্রতি বছর পুরুষ ভেড়া কিনতে অথবা পাল্টা পাল্টি করতে হবে যাতে একই বংশের মধ্যে প্রজনন না ঘটে। স্ত্রী ভেড়া যে এলাকা থেকে কেনা হয়েছে সেখান থেকে পুরুষ ভেড়া না কেনাই ভাল।

দলবদ্ধ হয়ে চাষ করলে নিজেদের মধ্যে প্রতি বছর পুরুষ ভেড়া বদল করে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম অবস্থায় (দেড় থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত) পুরুষ ভেড়াকে মাসে ১৫-২০ বার পাল দেওয়ার কার্যে ব্যবহার করা যায়। এরপর ৬-৮ বছর পর্যন্ত মাসে ২০-২৫ বার পাল দিতে দেওয়া যায়।

প্রজননের জন্য পুরুষ গাড়োল ভেড়ার পরিচর্যা

১. একটি পুরুষ গাড়োল ভেড়াকে প্রজননের জন্য সপ্তাহে দুবারের বেশী ব্যাবহার করা চলবে না।

২. প্রতিদিন শারীরিক ব্যয়ামের জন্য ফাঁকা জায়গায় চরাতে হবে।

৩. বেশী চর্বিযুক্ত গাড়োল ভেড়াকে প্রজননে ব্যাবহার করা চলবে না। দেখতে হবে পাঁঠাটি যেন কখনই চর্বিযুক্ত না হয়।

৪. প্রতিদিন পর্যাপ্ত সবুজ ঘাস এবং অন্তত ১০০ গ্রাম সুষম দানাখাবার খেতে দিলে ভালো হয়। একটি পাঁঠাকে ৫ কেজি সবুজ ঘাস খাওয়ালে ভাল হয়। প্রতিদিন সবুজ ঘাস ব্যতীত ১০০ গ্রাম সুষম দানা খাবার দিতে হবে।

৫. পাঁঠাটিকে প্রতিদিন ভালভাবে স্নান করাতে হবে।

৬. নিয়মিত পাঁঠাটিকে চিরুনি বা ব্রাশ দিয়ে আঁচড়াতে হবে।

প্রজননের জন্য স্ত্রী ভেড়া নির্বাচন

স্বাস্থ্যবতী, ধীর-স্থির প্রকৃতির স্ত্রী ভেড়া কেনা উচিত। পালান অবশ্যই ভেড়ার আকারের সঙ্গে মানানসই হবে। স্ত্রী ভেড়া কেনার সময় তার মা প্রতি বিয়ানে ও কতদিন ছাড়া বাচ্চা দিয়েছে এসব খোঁজ নিতে হবে। এসব খোঁজ নিয়ে কম বয়সের (৬-৮ মাস বয়সী) স্ত্রী ভেড়াও কিনে বড় করা যায় এবং উপযুক্ত সময়ে প্রজনন কার্যে ব্যবহার করা যায়। ভালো জাতের স্ত্রী ভেড়া সাধারণত ১৬ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা প্রসব করে এবং পরবর্তী কালে ৭-৮ মাস ছাড়া ২-৩ টি বাচ্চা দেয়। ৬-৮ বার বাচ্চা দেওয়ার পর প্রজননের কার্যে

স্ত্রী ভেড়াকে আর ব্যবহার না করাই ভাল। প্রজননের আগে স্ত্রী ভেড়ার স্থূলতা হ্রাসকরণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত চর্বি জমা ক্ষতিকর, তা প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করে এবং প্রজনন মৌসুমের এক থেকে দুই মাস আগেই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রজনন ঋতু শুরু হওয়ার দুই থেকে তিন সপ্তাহ আগে তাদের শরীরের ওজন সঠিক রাখার জন্য ভেড়াকে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবারের পরিমান বাড়ানো উচিত। এর ফলে প্রজনন হার বৃদ্ধি পায় সুতরাং ভেড়ার পালের মধ্যে জন্মহার বৃদ্ধি পায়। গাড়োলের প্রজনন সারা বছর হয় এদের কোনো নির্দিষ্ট প্রজনন ঋতু থাকে না, তবে লক্ষ্য করা গেছে পশ্চিমবঙ্গে গাড়োল ভেড়ার প্রজননের সর্বোচ্চ সময় হলো ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী এবং অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।

স্ত্রী ভেড়ার প্রজনন ক্ষমতা নির্ভর করে মূলত–পুষ্টি, জাত, ঋতুচক্র, পরিচর্যা ও রোগজ্বালার উপর। প্রজননের জন্য ব্যবহৃত স্ত্রী ভেড়ার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দরকার--

১. শরীর সোজা, লম্বাটে, সবল, স্বাস্থ্যবান

২. পা দুটি শক্ত ও সোজা

৩. সরু কাঁধ ও চওড়া কোমর

৪. শরীর ও পা আঘাত হীন

৫. চকচকে ত্বক

৬. পালানগুলি ভেড়ার আকারের সহিত মানানসই

৭. পালানের লোমগুলি পশমের মতো নরম

৮. ভরা পালান দুধ দোহনের পর চুপসে যায়

৯. পালানের দুটি বাট আলাদা হবে ও দুটিতেই দুধ আসবে

১০. পালানের সঙ্গে মানানসই বাঁট ও দুগ্ধ শিরা বেশ স্পষ্ট

সঠিক প্রজনন পন্থা অবলম্বন:

সাধারণত স্ত্রী ভেড়া ১৯-২১ দিন পরপর গরম (heat stage) হয় এবং ১৮-৩৬ ঘন্টা গরম থাকে। যখনই গরম হয়েছে জানা যাবে তখনই একবার এবং তার ১০-১২ ঘন্টা পর অবশ্যই ঋতুমতী স্ত্রী ভেড়াকে প্রজননক্ষম পুরুষ ভেড়ার কাছে নিয়ে যেতে হবে। গর্ভবতী না হলে ১৯-২১ দিন পর ভেড়াটি পুনরায় গরম হবে।

ভেড়ার গর্ভধারণকাল গড়ে ৫ মাস (১৪৭-১৫৪ দিন) এবং প্রসবের ৩০-৩৫ দিন পরই প্রজনন অঙ্গ সমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তাই প্রসবের ৪৫-৪৬ দিনের পর আবার গরম হলে প্রজনন করানো যেতে পারে। উপযুক্ত খাদ্য এবং পরিচর্যা এক্ষেত্রে খুবই দরকার।

প্রথম বাচ্চা দেওয়ার বয়স, ২ বার বিয়ানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এবং প্রতি বিয়ানে কটি করে বাচ্চা দিচ্ছে এসব তথ্য লিপিবদ্ধ রাখলে স্ত্রী ভেড়া বাছাইয়ের কাজে সুবিধা হয়।

প্রথম বাচ্চা প্রসবের পর, স্তন্যপান করানোর সময় স্ত্রী ভেড়ার স্তন ভালভাবে বিকশিত হয় না এবং বাঁটগুলি ছোট হয়। সুস্থ স্বাভাবিক ভেড়ার বাচ্চার ওজন বৃদ্ধির হার এইরূপে হয়-

বয়স	ওজন
জন্মের সময়	(০.৬-১.০) কেজি
তিন মাস	(৪.১-৫.৮) কেজি
ছয় মাস	(৬.০-৮.৬৮) কেজি
এক বছর	(১০.৪ - ১৪.৪) কেজি

Banerjee (2015), পশ্চিমবঙ্গে গাড়োল ভেড়ার দৈহিক সূচক তৈরি করেছেন। শরীরের বিভিন্ন সূচক, যেমন- উচ্চতা সূচক, ডিম্বাশয় বৃদ্ধি সূচক, দৈর্ঘ্য সূচক, শরীরের ওজন সূচক, বক্ষের বিকাশের সূচক, পশ্চাৎদেশের-দৈর্ঘ্য সূচক ইত্যাদি গণনা করা

হয়েছিল। পুরুষ ও স্ত্রী ভেড়ার রূপগত বৈশিষ্টের কারণে লেখক গাড়োল কে ক্ষুদ্র ভেড়া হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং এই ভেড়ার ছোট আকারের জন্য পূর্ববর্তী গবেষকদের দ্বারা উল্লিখিত দৈহিক সূচক গুলির ক্ষেত্রে খুব বেশি পার্থক্য নেই। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন স্থানে লালনপালন করা পুরুষ ভেড়া এবং স্ত্রী ভেড়ার মধ্যে দৈহিক সূচক গুলি আলাদা। যে পার্থক্যগুলি বিদ্যমান, সেগুলি জেনেটিক এবং নন-জেনেটিক কারণগুলির উপর নির্ভরশীল। পুরুষ ভেড়া, স্ত্রী ভেড়া এবং ভেড়া শাবকের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় যৌন দ্বিরূপতার কারণে। উভয় লিঙ্গের কাঠামোগত সূচক বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তিত হয়। কানের পাতার দৈর্ঘ্য ১ সেমি থেকে ৪.২৫ সেমি পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। দেহকাঠামোর আয়তনের পার্থক্যগুলি মূলত ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী।

গাড়োল ভেড়া প্রজনন ও পালন সম্পর্কীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

ক) একই প্রজাতির মধ্যেই প্রজনন করা উচিত। বেশী মাংসের লোভে গাড়োল ভেড়াকে কখনই অন্য প্রজাতির পুরুষ ভেড়া দিয়ে প্রজনন করানো উচিত নয়।

খ) সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী গাড়োল ভেড়াকে রক্তের সম্পর্কহীন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ গাড়োল ভেড়ার মাধ্যমেই প্রজনন করালে সবচেয়ে ভাল ফল লাভ করা যায়।

গ) অনুপযোগী ভেড়ার বাছাই পদ্ধতি অনুসরন করা উচিত। যে সমস্ত স্ত্রী ভেড়ার বৃদ্ধির হার কম, অনেকদিন ছাড়া মাত্র ১টি করে বাচ্চা দেয়, যাদের প্রজননঘটিত সমস্যা আছে, ছোঁয়াচে রোগ আছে বা যারা দুর্বল ও মৃত বাচ্চা প্রসব করে এমন ভেড়া বাছাই করার পর খামারে না রাখাই ভাল। বংশবৃদ্ধির কাজে এদের ব্যবহার না করে এদের মাংসের জন্য বিক্রি করে দেওয়া উচিত। উৎপাদনশীলতা বিচারের পর প্রতিবছর ১৫-২০ শতাংশ অনুপযোগী ভেড়া বাছাই ও বিক্রি করে দেওয়া দরকার।

একটি রিপোর্ট অনুযায়ী (সিং এবং বোহরা, ১৯৯৬) (৭-৮) বছরের দীর্ঘায়ু সহ বেশ কিছু ভেড়ার জীবদ্দশায় গড়ে (১০-১২) টি করে মেষশাবক জন্ম দেবার তথ্য পাওয়া গেছে। সেই পরিসংখ্যানে এও

উল্লেখ করা হয়েছে যে বেশ কিছু ভেড়া পালক কসাইয়ের জন্য ভেড়া বিক্রি করেন না, তবে মৃত্যুর ঝুঁকি এড়াতে বর্ষার আগে কিছু ভেড়া কসাইয়ের জন্য বিক্রি করা হয়।

কেন পাঁঠা পরিবর্তন করা দরকার

১) পাঁঠা পরিবর্তন না করলে ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন (Inbreeding Depression) হবে, অর্থাৎ আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট জিনগত দুর্বলতা বা ক্ষতির কারণে জীবের শারীরিক বা মানসিক ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। বাংলায় একে "অন্তঃপ্রজনন বিষণ্নতা" বলা হয়। এটি মূলত জিনগত বৈচিত্র্য কমে যাওয়ার কারণে এবং এবং ক্ষতিকারক জিন (deleterious genes) বেশি পরিমাণে প্রকাশ পাওয়ার জন্য ঘটে, যা ইনব্রিডিং বা আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে প্রজননের ফলে হয়। এক্ষেত্রে, সম্পর্কিত প্রানীদের মধ্যে প্রজননের ফলে বংশধরদের মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্য কমে যায়। এর ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন রোগ বা শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে, যা তাদের টিকে থাকার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ইনব্রিডিং ডিপ্রেশনের ফলে সেখানকার প্রাণীদের মধ্যে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি বা তাদের উর্বরতা কমে যাওয়া দেখা যেতে পারে, বাচ্চা পেটের মধ্যে মারা যেতে পারে, বাচ্চা অপুষ্ট হতে পারে। কখনও কখনও গর্ভপাতও হতে পারে।

২) সাধারণত দেড় থেকে দুই বছর পর পর পাঁঠা পরিবর্তন করা জরুরী।

৩) যে কোনো খামারে অধিক পক্ষ্যে ১:৫ অনুপাতে পুরুষ ও স্ত্রী ভেড়া থাকা দরকার।

৪) দেড়-দুই বছর অন্তর পাঁঠগুলোকে পাড়া পরিবর্তন করাতে হবে। যেমন, পূর্ব পাড়ার পাঁঠা পশ্চিমপাড়ায়, উত্তর পাড়ার পাঁঠা, দক্ষিণপাড়ায় তাহলে এমনিভাবে একটি পাঁঠাকে আমরা পাঁচ থেকে ছয় বছর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারি।

৫) একটা পাঁঠাকে সর্বাপেক্ষা দিনে ১-২ বার এর বেশী ব্যবহার করা উচিৎ নয়। সপ্তাহে তিন-চার বার ব্যবহার করলে পাঁঠার

শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এই সময় পাঁঠার খাবার, পুষ্টি, ইত্যাদির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

৬) পাঁঠা পরিবর্তন না করলে উন্নত গুণ সম্পন্ন (Quality graded) বাচ্চার বদলে রুগ্ন বাচ্চা দেখা যেতে পারে ফলস্বরুপ বাচ্চা উৎপাদনের হারও কমে যাবে।

ভেড়ার বয়স নির্দ্ধারণ করার পদ্ধতি

ভেড়ার নিচের চোয়ালে দাঁত দেখে বয়স নির্দ্ধারণ করা হয়।

১. যদি দাঁত জোড়া, ছোট ও ধারালো থাকে তা হলে ১ বছর ধরে নিতে হবে।

২. এক বছর দুই মাস বয়সে মাঝের প্রথম জোড়া দাঁত উঠে গিয়ে স্থায়ী জোড়া দাঁত হবে।

৩. দুই বছর বয়সে দুই জোড়া স্থায়ী দাঁত থাকবে।

৪. তিন বছর বয়সে তিন জোড়া স্থায়ী দাঁত থাকবে।

৫. পাঁচ বছর বয়সে চার জোড়া স্থায়ী দাঁত থাকবে।

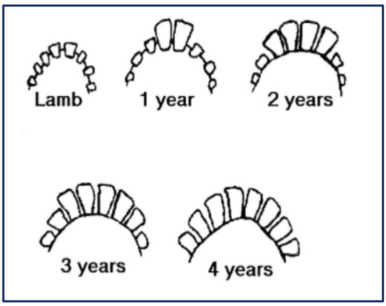

বিভিন্ন বয়সের ভেড়ার দাঁত

কৃত্রিম প্রজনন-- সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গে এখন চালু হয়নি, কিছু বে-সরকারি সংস্থা বর্তমানে কিছু জায়গায় করছে, তবে পাল খাওয়ানোর বর্তমান পদ্ধতি এখনও জনপ্রিয়,

সংকরায়ন-- অন্য জাতের কোনো পাঁঠা দিয়ে গাড়োল ভেড়াকে সংকরায়ন করা চলবে না। সংকরায়নের ফলে জন্ম নেওয়া বাচ্চা তৃতীয় প্রজন্মে গিয়ে গাড়োল ভেড়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, যার জন্য গাড়োল ভেড়ার এত কদর, যেমন – প্রতি বিয়ানে বাচ্চার সংখ্যা কমে যাওয়া, মাংসের স্বাদ ও গন্ধ কমে যাওয়া, চামড়ার দাম কমে যাওয়া, ইত্যাদি।

ভেড়া পালন পদ্ধতি

ক) বাড়ীর চত্বরে পালন: চারন ভূমির স্বল্পতা ও অন্যান্য কারনে পশ্চিমবঙ্গে এই পদ্ধতিতেই মূলত গাড়োল ভেড়া পালন করা হয়। বাড়ীর উচ্ছিষ্ট ও বাগানের চাষের জমির, পতিত জমির আশপাশ থেকে খাবার দিয়ে কম খরচে ভেড়া পালন করা হয়। তবে খুব বেশী ভেড়া (অনধিক ১০-১৫ টি) এইভাবে পালন করা যায় না বলে বাৎসরিক আরও ২৫-৩০ হাজার টাকার বেশী আশা করা অনুচিত। এই পদ্ধতিতে ভেড়া পলনের জন্য খুব বেশী আর্থিক বিনিয়োগ দরকার পড়ে না। বাড়ির মহিলারাই দেখাশোনা করতে পারে।

গৃহসংলগ্ন বাগান, উঠান, খেলার মাঠ, নদী বা খালের পাড় বা আশপাশের কোন বনভুমিতে সারাদিন চরিয়ে শুধুমাত্র রাত্রি থাকার জন্য উপযুক্ত ভেড়ার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। চাষের উপজাত দ্রব্য যেমন - খুদ, কুঁড়ো, ভূষি খোল এবং রান্নার উপজাত দ্রব্য যেমন ভাতের ফ্যান, কাটা শাক সবজি ইত্যাদি খাওয়ানো যায়। এর সঙ্গে কিছুটা (১০০-১৫০ গ্রাম / প্রতিদিন) দানা বা ম্যাস খাওয়ালে ভেড়ার বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার তরান্বিত হয়। তবে স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রেখে নিয়মিত কৃমির ঔষুধ ও টিকার ব্যবস্থা করা দরকার।

স্বল্প খরচে বাসস্থান নির্মান

গ্রামাঞ্চলে ভেড়াকে বাড়ির বারান্দায়, রান্নাঘরে বা শোবার ঘরে অথবা অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীদের সাথে গোয়ালে রেখেই পালন করা হয়। ভিজে বা স্যাঁতস্যাঁতে বাসস্থান ভেড়ার একেবারেই পছন্দ নয়। তাই ভেড়ার থাকার জায়গা শুকনো ও পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভেড়া থাকার ঘরে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা এবং বৃষ্টি ও ঠান্ডা যাতে না আসে সেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সঠিক হারে শারিরিক বৃদ্ধি, বংশবিস্তার এবং রোগ আক্রমনের হাত থেকে বাঁচাতে হলে ভেড়ার বাসস্থান বিজ্ঞান সম্মত ভাবে তৈরি করা দরকার। বাসস্থানে নির্মানের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মেনে চলা উচিত।

১) ভেড়ার ঘর উঁচু জায়গায় করতে হয়। ভূমি থেকে মেঝের উচ্চতা ৩-৪ ফুট হওয়া দরকার। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হল ঘরে আলো বাতাস বেশী খেলে তবে ঘর কখনই ১৫ ফুটের বেশী চওড়া হবে না। ঘরগুলি স্যাঁতসেঁতে এবং ধুলো প্রতিরোধী হওয়া উচিত।

২) সহজলভ্য স্থানীয় প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে ঘর তৈরী করা লাভজনক। মেঝে থেকে ঘরের উচ্চতা সিলিং) কমপক্ষে ৭ ফুট হওয়া চাই। এবং দোচালা ঘরের মাঝের উচ্চতা ১০ ফুট হওয়া প্রয়োজন।

৩) সাধারণত প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া পিছু ১০ বর্গফুট জায়গা হলেই হয়।

৪) ঘরের ছাদ সামর্থ্য অনুযায়ী ছাদ, টালি, খড়, অ্যাসেবেসটস বা গোলপতা দিয়ে তৈরী হতে পারে।

৫) ঘরের মেঝে মাটির হলেই ভাল হয়। পাকা সিমেন্টের মেঝে ভেড়ার পক্ষে নানাকারনে উপযুক্ত নয়। তুলনায় মাটির শোষন ও শোধন ক্ষমতা অনেক বেশী। বর্ষাও শীতের শেষে মেঝে থেকে ২ ইঞ্চি পরিমান উপরের মাটি তুলে ফেলে দিয়ে আবার নতুন মাটি (কিছুটা চুন ও পটাসিয়াম মিশিয়ে) দিয়ে ভরাট করা দরকার। এতে রোগব্যাধির প্রকোপ কমে।

৬) মেঝে থেকে ঘরের দেওয়াল ৭ ফুট হওয়া উচিত। যার মধ্যে ৫ ফুট দেওয়াল মাটি, ইট বা কঠ দিয়ে করা হয় এবং বাকি ২ ফুট তার জালি এবং বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরী হলে ঘরে যেমন আলো ও বাতস সহজে ঢুকতে পারে তেমনি কটু অ্যামোনিয়ার গন্ধ বাইরে বেড়িয়ে যেতে পারে। বর্ষাও শীতের সময় এই তারজালির অংশটুকু পর্দা বা খড় দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। যাতে বৃষ্টির জল বা হিমেল হাওয়া সরাসরি ভেড়ার গায়ে না লাগাতে পারে। চুরি বা শিকারী প্রাণীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ভেড়ার ঘরের দরজা শক্তপোক্ত হওয়া দরকার। গাড়োল প্রতিপালকরা প্রায়ই শিকারী প্রাণীদের দ্বারা সমস্যার সম্মুখীন হয় যারা প্রায়ই গাড়োল ভেড়া আক্রমণ করে থাকে। গাড়োল ভেড়াকে

শিকারী প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অনেক গাড়োল প্রতিপালক কুকুর পোষণ করেন যারা গাড়োল ভেড়াকে রক্ষা করে এবং প্রায়ই প্রতিপালকরা শিকারী প্রাণীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে বৈদ্যুতিক বেড়া নির্মাণ করেন।

৭) বিভিন্ন বয়সের ভেড়া একই ঘরে পৃথক পৃথক ভাবে রাখা উচিত। যেমন- প্রজননক্ষম পুং ভেড়াকে কখনই গর্ভবতী বা সদ্য বিয়ানো স্ত্রী ভেড়ার সঙ্গে রাখা উচিত নয়, এর জন্য ৪ ফুট উঁচু বাঁশের বেড়া ব্যবহার করতে হবে। রুগ্ন ভেড়াকে আলাদা ঘরে রাখা উচিত।

৮) ভেড়া উঁচু জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। তাই ঘরের মধ্যে ১-২ ফুট চওড়া ও উচ্চতাযুক্ত ২-৩ ধাপ বিশিষ্ট বাঁশ ব কাঠের মাচা করে দিলে ভাল হয়। এতে সময়বিশেষে কম জায়গায় বেশী ভেড়া রাখাও যায়।

৯) ভূমি থেকে মেঝের উচ্চতা ৩-৪ ফুট হওয়া দরকার।

১০) সাধারণ অবস্থায় খাবার ও জলের পাত্র ঘরে রাখা ঠিক নয়। তাছাড়া প্রতিদিন ভেড়ার মল মূত্র পরিষ্কার করে ঘরকে শুকনো রাখতে হয়।

১১) ভূমি থেকে ঘরে ঢোকার জন্য দরজা বরাবর মাটি দিয়ে ঢালু রাস্তা তৈরী করতে হবে।

চারণভূমিতে ভেড়া

স্বল্প খরচে নির্মিত বাসস্থান

স্বল্প খরচে নির্মিত বাসস্থান

খ) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভেড়া পালন

শুরুতে প্রয়োজন ৩০-৫০টি ভাল মানের প্রজননক্ষম স্ত্রী ভেড়া, ৩-৫ টি পুরুষ ভেড়া, কমপক্ষে ৫-৭ বিঘা উঁচু জমি, ৫-৭ লক্ষ টাকা মূলধন এবং অন্যান্য উপকরন। তবে এই পদ্ধতিতে ভেড়া পালনে বাৎসরিক খামারের আকৃতি অনুযায়ী আয় ১.২৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বাজারিকরনের সুযোগ ও চাহিদা পরিমাপ করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত খামারের আকৃতি ঠিক করা উচিত। তাছাড়া, উপভোক্তার ভেড়া পালনে সঠিক প্রশিক্ষন, চোখে দেখা অভিজ্ঞতা এবং হাতে কলমে দক্ষতা থাকা আবশ্যিক। শুরুতেই বড় মাপের ঋন বা আর্থিক সাহায্য নিয়ে ভেড়া খামার না করাই ভাল। মনে রাখতে হবে খামার শুরু করার অন্ততপক্ষে ২ বছর পর থেকে আয় চোখে দেখা যায়। আমাদের রাজ্যে এখনও পর্যন্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সাফল্য পেয়েছেন এমন উদাহরণ দেখাই যায় না।

জেনে রাখা ভাল, এই ভেড়া পালন খামার স্থাপন করতে হলে ভেড়ার প্রকার অনুযায়ী বিস্তারিত বাসস্থান ও চারণভূমি আবর্ত পদ্ধতিতে (Rotational Grazing Field) তৈরী করতে হয়। খামারের চারপাশে প্রাণী খাদ্যে গাছ (সুবাবুল জাতীয় গাছ) লাগানো যেতে পারে যা বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে।

যেমন-

১) স্ত্রী ভেড়ার ঘর (Ewe shed)

২) বাড়ন্ত ভেড়ার ঘর (Grower Shed)

৩) বাচ্চা প্রসবের ঘর (Kidding Shed)- গর্ভবতী ভেড়ার জন্য প্রসূতি কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৪) পুরুষ ভেড়ার ঘর (Ram Shed)

৫) পৃথকীকরণ ঘর (Isolation Shed)- নূতন আনা প্রাণী, দুর্বল, অক্ষম প্রাণীদের আলাদা করে রাখা হয়।

৬) গো-ডাউন (Go-down)

৭) শুকনো এবং দানা খাবারের ঘর (Fodder & Con Room)

৮) পশম কাটার সরঞ্জাম ও পশম সংরক্ষণের ঘর (Shearing Room)

৯) চিকিৎসা কক্ষ (Medical Unit)

১০) অফিস ঘর (Office Room)

১১) পাম্প ঘর (Pump & Generator Room)

১২) সিকিউরিটি ঘর ইত্যাদি (Security Cabin)

এই প্রতিটি ঘর তৈরীর নির্দিষ্ট মাপ ও মান আছে। তাছাড়া ভেড়া থাকার প্রতিটি ঘরের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কিছুটা করে খোলা জায়গা (Paddock) রাখা দরকার।

নং	ভেড়ার প্রকার	ভেড়া পিছু জায়গা প্রয়োজন (ঘরে)	খোলা জায়গা
১	প্রজননক্ষম পুরুষ ভেড়া বাচ্চা	২০ বর্গ ফুট	৪০ বর্গ ফুট
২	গর্ভবতী ও দুধ খাওয়ানো স্ত্রী ভেড়া	২০ বর্গ ফুট	৪০ বর্গ ফুট
৩	বাড়ন্ত ভেড়া	৩ বর্গ ফুট	৬ বর্গ ফুট
৪	পূর্ণবয়স্ক ভেড়া	৬ বর্গ ফুট	১২ বর্গ ফুট

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভেড়া পালনের বাসস্থান

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভেড়া পালনের বাসস্থান

খামারের প্যাডকে ভেড়া পালন

ভেড়া পালনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১) প্রজনন অঞ্চল: যতদূর সম্ভব একই কৃষি- জলবায়ু অঞ্চল থেকে প্রজননক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ ভেড়া (পয়েন্ট স্টক) বাছাই করে কেনা উচিত। এতে জলবায়ু ঘটিত 'স্ট্রেস' বা ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাবে।

২) সঙ্গরোধ বা আলাদা রাখার ব্যবস্থা (Qurantine Practice): বাইরে থেকে ক্রয় করা ভেড়াকে কখনই সরাসরি খামারের বা বাড়ির পালিত ভেড়ার সঙ্গে একসঙ্গে রাখা উচিত নয়। খামারের বাইরে (কিছুদূরে) কোন ঘরে অন্ততপক্ষে ২১ দিন রেখে দেখা উচিত বাইরের ক্রয় করা ভেড়ার মধ্যে কোন রোগের লক্ষন প্রকাশ হচ্ছে কিনা। এই সময় ঐ ভেড়াগুলিকে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মত কৃমিনাশক ঔষুধ এবং টীকাকরন করা যেতে পারে। ২১ দিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে তবেই বাইরের ভেড়াকে নিজ খামার, বাড়ির পালিত ভেড়ার সঙ্গে একসঙ্গে পালন করতে পারেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভেড়া পালনের ইহা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই পদ্ধতি না মেনে চলার ফলে বহু খামার সর্বশান্ত হয়েছেন।

৩) ভেড়া সংগ্রহ ও বাছাইয়ের সময় পুরুষ ও স্ত্রী ভেড়ার মধ্যে রক্ত সম্পর্কহীনতার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। নিকট রক্তসম্পর্কযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রী ভেড়ার মধ্যে প্রজনন ঘটালে দুর্বল ও রুগ্ন বাচ্চা জন্মায়। ফলে তা খামারের পক্ষে লাভজনক হয় না।

প্রতিপালন ও পরিচর্যা

ভেড়ার মল-মূত্রের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার

ভেড়ার মল-এ গোবর অপেক্ষা দ্বিগুন পরিমানে নাইট্রোজেন থাকে। ভেড়ার মূত্রেও অ্যামোনিয়ার পরিমান অনেক বেশী। তাই মূত্র শোষিত ভেড়ার মল থেকে উৎকৃষ্ট জৈবসার উৎপাদন করা যায়। খামার থেকে দূরে উঁচু স্থানে ৩ ফুট গভীর গর্ত করে তাতে ভেড়ার ঘর ঝেঁটিয়ে সমস্ত বর্জ্য ফেলতে হবে। প্রতিদিন এরূপ করার ফলে যখন গর্তটি ভর্তি হয়ে যাবে, তখন কাদামাটি লেপে গর্তের মুখ ৩ মাস বন্ধ করে রেখে দিলে কালো রঙের উৎকৃষ্ট জৈবসার তৈরী হয়। এই সার কৃষিকার্যের পক্ষে খুবই উপকারী। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভেড়ার ঘর যেমন পরিষ্কার ও শুকনো থাকে তেমনি পরিবেশ দূষনও হয় না।

কৃষিকার্যের যেমন বীজ ভাল হলেই বেশী ফসল উৎপাদন হয় না সঠিক পরিচর্যার অভাবে। ঠিক তেমনি উন্নত জাতের ভেড়া হলেই হবে না তার সঠিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রতিপালন ও পরিচর্যাও দরকার।

১। গাভীন ভেড়ার পরিচর্যা: গাভীন ভেড়াকে প্রজননক্ষম পুরুষ ভেড়া থেকে আলাদা রাখতে হবে। গর্ভধারন কাল গড়ে ৫ মাস। তাই স্ত্রী ভেড়াকে যে দিনটিতে প্রজনন করানো হল সেটা খাতায় লিখে রাখলে বাচ্চা প্রসবের দিন সহজেই অনুমান করা যায়। গর্ভাবস্থায় শেষ দুমাস মা ভেড়াকে প্রতিদিন ১৫০-২০০ গ্রাম করে দানা জাতীয় সুষম খাদ্য দিলে সুস্থ ও সবল বাচ্চা পাওয়া যায়। তবে শেষ সপ্তাহে দানা খাবার কমিয়ে সবুজ ঘাস বেশঈ করে দিতে হয়।

প্রসব স্থানটি শুকনো ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা দরকার। গাড়োল ভেড়া সাধারণত ২-৩ টি বাচ্চা একসঙ্গে দেয়। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা দরকার। প্রসবের পর মা ভেড়ার পিছনের দিকটা পরিস্কার ও শুকনো কাপড় দিয়ে পরিস্কার করে দিতে হবে। বাচ্চার যত দ্রুত সম্ভব গাঁজলা দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মা ভেড়াকে গুড়, ভূষি, লবন ইত্যাদি ঈষৎ উষ্ণ জলের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ফুল বা প্লাসেন্টা দ্রুত পড়ে যায়।

২। জন্মের পর বাচ্চার পরিচর্যা: বাচ্চা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশীরভাগ সময় মা চেটে পরিস্কার করে দেয়। যদি কোনক্ষেত্রে না করে তাহলে পরিষ্কার শুকনো কাপড় দিয়ে বাচ্চার দেহ ও মুখ ভালভালে পরিস্কার করে দিতে হবে এরপর বাচ্চা যাতে গাঁজলা দুধ বা কোলোস্ট্রাম খেতে পায় তা দেখা দরকার। গাঁজলা দুধ নবজাতক বাচ্চার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া নবজাতকের নাভি পেটের দিক থেকে ১.৫ ইঞ্চি রেখে নতুন ব্লেড বা গরম জলে ফোটানো কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে হয় এবং সেই স্থানে কোন জীবানুনাশক যেমন আয়োডিন বা লাল ঔষধ লাগাতে হবে পরবর্তী ৩-৪ দিন পর্যন্ত।

যদি কোন ক্ষেত্রে মায়ের গাঁজলা দুধ না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে বাচ্চা হয়েছে এমন ধাতৃমায়ের দুধ নবজাতকদের খাওয়ানো যেতে পারে।

প্রথম ২ সপ্তাহ বাচ্চারা কেবল মায়ের দুধ খাবে। তারপর ধীরে ধীরে ঘাস ও কচিপাতা খেতে শুরু করে। দুই মাস পর থেকে বাচ্চাকে উচ্চ খাদ্যগুন সম্পন্ন দানা জাতীয় খাবার ৫০ গ্রাম করে প্রতিদিন খাওয়ালে বাচ্চার বৃদ্ধি ভালো হয়। বাচ্চাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অত্যাধিক গরম বা শীতের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দেশে ১-৫ সপ্তাহের বয়সের ভেড়ার বাচ্চার মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী। অপুষ্টি, কৃষিজনিত রোগ এবং অপরিচ্ছন্নতা জনিত বিভিন্ন পেটের অসুখ মূলত বাচ্চার মৃত্যুর প্রধান কারণ। তাই উপরিউক্ত বিষয়গুলিতে সাবধানতা গ্রহন করতে হবে।

খাসীকরন: সুস্থ ও সবল বাচ্চাকে এক মাস বয়সেই খাসী করা যায়। তবে গ্রামীন পদ্ধতিতে (বাঁশের পাত্র ও ছাই বা ধূলো) খাসী না করাই উচিত। এতে ধনুস্ট্রংকার (Tetanus) এর মত প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু বাচ্চা অকালে নষ্ট হয়। স্থানীয় প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খাসী করার ব্যবস্থা আছে।

৩। বাড়ন্ত ভেড়ার পরিচর্যা: ছেড়ে পালন করলে তন্ত্র জাতীয় খাদ্যের বেশীরভাগটাই এরা চারণভূমি থেকে যোগাড় করে নেয়। তবে কিছুটা (৫০-১০০ গ্রাম প্রতিদিন) দানা জাতীয় খাদ্য দিলে

দৈহিক বৃদ্ধি ভাল হয়। নিয়মিত কৃমিনাষক ঔষুধ এবং ৩ মাস বয়স হলেই পিপিআর এবং পক্সের টীকাকরন প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত অবশ্যই করাতে হবে।

৪| প্রজননক্ষম স্ত্রী ভেড়ার পরিচর্যা: গাড়োল প্রজাতির ভেড়া ৭-৮ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম ওয়ে ওঠে। স্ত্রী ভেড়ার গরম হবার লক্ষণগুলি (যেমন অস্থিরতা প্রকাশ, অন্য ভেড়ার উপর ওঠার চেষ্টা, লেজ দুপাশে ঘন ঘন নাড়ানো, যোনিদ্বার লাল ও ফোলা ভাব, লালসানি পড়া ইত্যাদি) দিকে নজর রাখতে হয়। সকাল বেলায় ভেড়া ছাড়ার সময় পুরুষ ভেড়ার সামনে দিয়ে নিয়ে গেলে বোঝা যায় কোন ভেড়াগুলি গরম হয়েছে। উন্নত মানের সুস্থ সবল এবং রক্তের সম্পর্কহীন পুরুষভেড়ার সঙ্গে প্রজনন করান উচিত। ভেড়া যথাসময়ে গাভীন না হলে প্রাণীচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৫। প্রজননক্ষম পুরুষ ভেড়ার পরিচর্যা: প্রজননের কার্যে ব্যবহৃত পুরুষ ভেড়াকে সকাল-বিকাল অন্তত দুঘন্টা করে আলাদাভাবে মাঠে চরানো দরকার। পর্যাপ্ত পরিমানে সবুজ ঘাস ছাড়াও প্রজনন ঋতুতে দৈনিক ১৫০-২০০ গ্রাম দানা জাতীয় সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া নিয়মিত কৃমিনাষক ঔষুধ এবং টীকাকরণের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রতিটি প্রজননক্ষম পুরুষ ভেড়ার জন্য আলাদা বাসস্থান হলে ভাল হয়।

গাড়োল ভেড়া পালনের জন্য কিছু বিশেষ টোটকা

১। বাচ্চা জন্মানোর পর থেকে ২ মাস বয়সের মধ্যে ৫ বার কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে, যথাক্রমে ৩, ৭, ২৮, ৪০ ও ৬০ দিনে।

২। ২ মাস বয়সের পর সূচী অনুসারে PPR, Pox, ET & TT ও FMD-র টীকা দিতে হবে। টীকা দেওয়ার ৭ দিন আগে কৃমিনাশক ও টীকার ৩-৭ দিনের মাথায় ইমিউনোস্টিমুলেন্ট দিলে চমৎকার ফল হয়।

৩। ২ মাস বয়সের পর সমস্ত ভেড়াকে মিনারেল ব্লক চাটানোর অভ্যাস করালে প্রতিমাসে গড়ে ৩ কেজি ওজন বৃদ্ধি পাবে। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন ব্লকে কপার থাকে।

৪। প্রতি ১০ কেজি ওজনের জন্য, দৈনিক ১৫০গ্রাম হারে সুষম খাবার ও অন্যান্য পেট ভরানো খাবার সাথে দিতে হবে। গর্ভবস্থায় ৫০ গ্রাম বেশি প্রয়োজন হবে। দুগ্ধবতী হলেও ৫০ গ্রাম বেশী খাবার দিতে হবে।

৫। জলপানের অভ্যাস (৫০০ মিলি ১ লিটার নিশ্চিত করতে হবে) এর জন্য প্রথম দিকে চিনি, লবন ও লেবুর রস ব্যবহার করলে সুফল হয়।

৬। ভেড়া-কে কোন অবস্থায় রাত্রিতে মাটিতে রাখা যাবে না। বাঁশের মাচা, পাটাতন বা খড় ভর্তি বস্তার উপর রাখা যেতে পারে।

৭। ভাল বাচ্চা পেতে সঠিক ও পূর্ণবয়স্ক পাঁঠা নির্বাচন প্রয়োজন। জন্মকালীন ওজন ২ কেজি বা বেশি হলে সেই পাঁঠার প্রজনন ক্ষমতা ভাল হয়। নিয়ম মেনে একই জায়গার পাঁঠা বার বার ব্যবহার না করে অন্য স্থানের পাঁঠা ব্যবহার করা দরকার।

৮। ভেড়া রাতে যাতে নিরবিচ্ছন্ন বিশ্রাম পায়, তার জন্য বিকেলে চিরুনী দিয়ে গা আঁচড়ে ও রাতে মশারীর মধ্যে রাখলে ভাল হয়।

৯। ভেড়ার জন্য ঘাসপাতা সবসময় নাগাল যোগ্য উঁচুভাবে ঝুলিয়ে বা বৈজ্ঞানিক ভাবে তৈরী পাত্রে দিতে হবে।

১০। প্রতি ভেড়াকে ওজন করে বৃদ্ধির পরিমাপ করে ঘাটতি থাকলে, গ্রোথ প্রমোটার ও মাল্টিভিটামিন ব্যবহার দরকার।

শীতকালে ভেড়ার বাচ্চার মৃত্যুহার কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

১। গর্ভাবস্থায় স্ত্রী ভেড়াকে ET & TT -র টীকা সুনিশ্চিত করতে হবে। বাচ্চার বার্থ ওয়েট ১.৫-২ কেজি আনতে গর্ভবস্থায় দৈনিক ১৫০-২০০ গ্রাম সুষম খাবার দিতে হবে। খেয়াল

রাখতে হবে গর্ভাবস্থায় স্ত্রী ভেড়ার ওজন যেন ৫-১০ কেজি বৃদ্ধি পায়।

২। বাচ্চা জন্মানোর পর ৩-৫ ঘন্টার মধ্যে অন্তত ছয়বার গাজলা দুধ খাওয়াতে হবে এবং শুকনো কাপড় দিয়ে গা মুছিয়ে মাকে চাটতে (বাচ্চাকে) দিতে হবে।

৩। নাভি ২-২.৫ ইঞ্চি লম্বা রেখে পরিষ্কার সুতো দিয়ে বেঁধে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ৫% লোশনে পরিষ্কার করে Acriflavin লোশন দিনে তিনবার করে লাগাতে হবে ৭ দিন পর্যন্ত।

৪। বাচ্চা ও মার শরীর গরম রাখার জন্য প্রয়োজন মতন বাসস্থানে 100 Wt. বাল্ব ঝুলিয়ে দিতে হবে। মা-কে প্রসবের পর ইষৎ উষ্ণ জলে গ্লুকোজ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। মা-ভেড়াকে পর পর তিন দিন ১০০ গ্রাম করে মুসুর ডাল সেদ্ধ করে খাওয়ালে দুধের যোগান ভাল হয়। বাচ্চারা যথেষ্ট মা-র দুধ পাবে।

৫। বাচ্চা জন্মানোর তিনদিন পর মাল্টিভিটামিন ড্রপ (২-৩ ফোঁটা দিনে দুইবার) ও কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে। ৬-৮ সপ্তাহে ET & TT টিকা দিতে হবে।

৬। ঠাণ্ডা লাগা ও রক্ত পায়খানা চেক করতে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন/এনরোফ্লোক্সাসিন ও Amprolium বা নাইট্রোফুরাজন ব্যবহার চমকপ্রদ ফল দেয়।

৭। অনেক সময় মা ছাড়া বাচ্চা বড়ো করতে হয়। সেক্ষেত্রে- সমপরিমান গাভীর দুধ ও পরিষ্কার পানীয় জল মিশিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে প্রতি ৪ ঘন্টা অন্তর ফিডিং বোতলে করে খাওয়াতে হয়। তবে ঐ দুধ ১ ঘন্টার মধ্যে খাওয়াতে হবে। বাসী করা চলবে না। উন্নত ফার্মে টমিল্যাক বা স্যামল্যাক চার চামচ পেস্টের মতন করে খাওয়ালে ভাল ফল হয়।

৮। রাত্রিতে বাঁশের মাচায় ভেড়া রাখা ও মিনারেল ব্লক রাখা

৯। আমিষ খাবার হিসাবে অ্যাজোলা চাষ

১০। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সাঁড়াশী দ্বারা খাসিকরণ

লাভজনক ভাবে ভেড়া পালন

- গাড়োল জাতের ভেড়া পালন ।
- মুক্ত পদ্ধতিতে ছেড়ে পালন।
- বাছাই করা পুরুষ- স্ত্রীর মধ্যে প্রজনন।
- পর্যাপ্ত ও পরিমিত খাবার খাওয়ানো।
- ঋতুভিত্তিক সঠিক পরিচর্যা।
- সনাক্তকরণ।
- প্রয়োজন ভিত্তিক কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো ।
- নিয়মিত টিকা প্রদান।
- বীমা করন।
- সঠিক পদ্ধতিতে বিপনন।

ঋতু বিশেষে কর্মসূচী

ভেড়াপালনে গ্রীষ্মকালীন কর্মসূচী

সময়	করণীয় কাজ
সকাল ৪.৩০ থেকে সকাল ৫.০০	➢ গোয়ালঘর পরিষ্কার, সপ্তাহে একদিন জীবাণুনাশক মিশিয়ে ঘর পরিষ্কার ➢ মাসে দুদিন ঘরের ভিতর ও বাইরে চারিদিকে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো
সকাল ৫.০০ থেকে সকাল ৫.৩০	➢ প্রতিদিন ব্রাশ দিয়ে ঘসেমেজে (সপ্তাহে দুদিন ক্ষার সাবান দিয়ে) ভেড়াকে পরিষ্কার করে চান করিয়ে দেওয়া।
সকাল ৫.৩০ থেকে সকাল ৬.৩০	➢ সারাদিনের প্রয়োজনীয় সুষম দানা খাবারের অর্ধেক পরিমাণ খড়/বিচালি মিশিয়ে খেতে দেওয়া ➢ ভিটামিন-মিনারেল পাউডার খাবার জলের সঙ্গে না মিশিয়ে গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে জিভে চাঁটিয়ে বা মণ্ড করে খাওয়ানো ➢ প্রাণী খাদ্যগ্রহনের সময়ের মধ্যে সাবান দিয়ে ভেড়ার পালান, বাট ও নিজের হাত ধুয়ে দুধ দোয়া ➢ লক্ষ্য রাখতে হবে দুধ দোয়ার পরও যেন ভেড়া খেতে থাকে এবং দুধ দোয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভেড়া মাটিতে না বসে পড়ে
সকাল ৬.৩০ থেকে সকাল ৭.৩০	➢ পর্যাপ্ত জল (ভেড়া প্রতি ৩-৫ লিটার) খেতে দেওয়া ➢ বিক্রির জন্য দুধকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া

সকাল ৭.৩০ থেকে সকাল ৯.৩০	➢ প্রাণীদের মধ্যে গরম হবার লক্ষন প্রকাশ করলে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে ➢ রোগগ্রস্ত হবার লক্ষণ থাকলে তাকে আলাদা রাখতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে ➢ অসুস্থ প্রাণীর চিকিৎসা করানো ➢ প্রাণীকে মাঠে চড়াতে নিয়ে যাওয়া বা মাঠে না চরিয়ে ঘাস কেটে এনে খড়ের সঙ্গে কুচি কুচি করে কেটে খাদ্য তৈরি করে রাখা
সকাল ৯.৩০ থেকে সকাল ১০.৩০	➢ খামারের বিভিন্ন কাজ যেমন কৃমির ওষুধ (সকালে খালি পেটে, ৬ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার, তারপর প্রতি ৩ মাস অন্তর), ভ্যাকশিন (সুস্থ প্রাণীকে সকালে বা বিকালে), রোগগ্রস্ত প্রাণীর চিকিৎসার, দুধ বিক্রির প্রভৃতির খাতার হিসাব রাখা ➢ গোয়ালঘর সারানো ➢ প্রাণীর সুষম খাদ্য বা ঘাটা তৈরী
সকাল ১০.৩০ থেকে সকাল ১১.০০	➢ গোয়ালঘরে ছেড়ে দেওয়া ও পর্যাপ্ত সবুজ ঘাস ও জলের ব্যাবস্থা করে রেখে দেওয়া ➢ ২০ গ্রাম গুড়, ৫০ গ্রাম বেসন, ২ গ্রাম লবণ এবং ৩ গ্রাম খাবার সোডা মেশানো সরবত প্রতিটি ভেড়াকে দিনে একবার খাওয়ানো
দুপুর ১১.০০ থেকে বিকাল ৫.০০	**বিরতি**
বিকাল ৫.০০ থেকে সন্ধ্যা ৬.০০	➢ প্রচণ্ড গ্রীষ্মে প্রাণীর গা ধোয়ানোর ১৫ মিনিট পর সারাদিনের প্রয়োজনীয় সুষম দানা খাবারের অর্ধেক পরিমাণ সুষম দানা খাবার খেতে দেওয়া

সন্ধ্যা ৬.০০ থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০	➢ গোয়ালঘর পরিষ্কার করা (লক্ষ্য রাখতে হবে গ্রীষ্মকালে যেন পর্যাপ্ত হাওয়া ঘরে ঢোকে ➢ মশা মাছির উৎপাত থাকলে দরজায় ও জানালায় মশারী লাগিয়ে দেওয়া ➢ জলের পাত্রে পর্যাপ্ত জল খেতে দেওয়া
রাত ৯.০০ থেকে রাত ৯.৩০	➢ একবার গোয়ালঘর ঘুরে আসা ও লক্ষ্য রাখা কোন অসুবিধা আছে কিনা

বিশেষ সতর্কতা

- পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি, উচ্চতাযুক্ত, খোলামেলা, হাওয়াযুক্ত ঘরে প্রানীপালন
- দিনের বেলায় গাছের ঘন ছায়ায় এবং সন্ধ্যার পর থেকে রাত ৯.৩০ টা পর্যন্ত খোলামেলা, হাওয়াযুক্ত ফাঁকা জায়গায় প্রাণীকে রাখা
- প্রাণীকে পর্যাপ্ত জল খাওয়ানো
- দপুরের ২০ গ্রাম গুড়, ৫০ গ্রাম বেসন, ২ গ্রাম লবণ এবং ৩ গ্রাম খাবার সোডা মেশানো সরবত প্রতিটি ভেড়াকে দিনে একবার খাওয়ানো খুবই উপকারী
- প্রচণ্ড গরমে দিনে দুই থেকে তিন বার চান করানো (মাঝে মাঝে নিমপাতা দেওয়া জলে)
- প্রতিদিন গোয়ালঘর জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে
- সন্ধ্যায় ঘরে ধোঁয়া দেওয়া অবস্থায় প্রাণীকে ঘরে রাখা যাবে না
- গরমে হজমশক্তি কমে যাওয়ায় গুরুপাক খাবার (ফ্যাট জাতীয়) কম খাওয়ানো (সরষের খইল এর পরিবর্তে

তিল/তিসির খইল, মুগচুনির পরিবর্তে অরহরচুনি, মুসুরচুনি, বিউলিচুনি খাওয়ালে ভালো হয়)

- গরমের জন্য অনেক সময় দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী থাকে, তখন অকারণে জ্বরের ওষুধ প্রয়োগ না করা
- নিয়ম মেনে প্রতিষেধক টিকা প্রদান
- প্রয়োজন অনুপাতে গ্রীষ্মকালীন সবুজ ঘাস চাষ করা ও নিয়মিত সবুজ ঘাস খাওয়ানো
- আগামী বর্ষার কথা ভেবে গোয়ালঘর মেরামত করে রাখা ও কৃমিনাশক ঔষধ (মূলত চ্যাপ্টা কৃমিনাশক) খাওয়ানো

ভেড়াপালনে শীতকালীন কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমি অঞ্চলে শীতকালীন আবহাওয়া প্রানী পালনের জন্য আদর্শ। এই সময়ে বাতাসে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা কম থাকে, যা প্রাণীর পক্ষে খুবই আরামদায়ক। তবে শীতকালে প্রাণী পালনে কিছু নির্দিষ্ট সমস্যা দেখা দেয়। সে সব সমস্যাগুলি দূর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সমস্যা	প্রতিকার
বর্ষাকালে বিভিন্ন রকমের কৃমির ডিম বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পুকুর, ডোবা, চারণভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে যা শীতের শুরুতে ঘাসের মাধ্যমে, জলের মাধ্যমে কৃমির ডিম বেশি পরিমাণে প্রাণীর পেটে যায় এবং প্রাণীকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়, শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, অনেক সময় মারা যায়, বিশেষ করে বাচ্ছাদের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি হয়।	1. শীতকালে যেহেতু চ্যাপটা কৃমি ছড়ায় যে জন্য শীতের আগে সব বয়সের প্রাণীকে কৃমিনাশক ঔষধ (মূলত চ্যাপ্টাকৃমি) খাওয়ানো 2. দুমাস পর বা শীতের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসে ১ দিন সকালে কৃমিনাশক ঔষধ (আন্তঃ ও বাহ্য পরজীবীনাশক) খাওয়ানো

এই সময় সবুজ ঘাসের বৃদ্ধি কম হওয়ায় ঘাসের জোগান কম থাকে। ফলে শরীরে ভিটামিন, খনিজ লবণের অভাব দেখা দেয়। প্রাণী আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়।	1. প্রাণীকে প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে ভিটামিন, খনিজ লবণ পাউডার খাওয়াতে হবে 2. আগে তৈরি করে রাখা (শুকনো সবুজ ঘাস/হে) বা সাইলেজ প্রাণীকে খাওয়ানো
অনেক সময় পাতলা পায়খানা শুরু হয় এবং প্রাণীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।	এই সময় মাঠ থেকে ওঠা নতুন খড় সরাসরি খাওয়ালে পাতলা পায়খানা হয়। পুরানো খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন খড় খাওয়াতে হবে
স্বাভাবিক দুর্বলতা	এই সময় প্রতিদিন দুপুরে গুড় ও নুন জলের শরবত খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়। মারাত্মক হলে চিকিৎসকের পরামর্শে সেলাইন দেওয়া যেতে পারে
চর্মরোগ	বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় চর্ম রোগের জীবাণু প্রাণীর দেহে আসার সম্ভাবনা থাকে। শীতকালে তারই প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তাই প্রাণী ও গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং চর্ম রোগের প্রকার ভেদে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চিকিৎসা করাতে হবে
ঋতু পরিবর্তণের সময় প্রথম ঠান্ডা আবহাওয়ায় ব্যাপক হারে প্রাণীর ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়, সর্দি হয়, অনেকসময় মৃত্যুও হতে পারে	1. ঠান্ডা প্রতিরোধের জন্য গোয়াল ঘরের চারিদিকে চটের বস্তা বা প্লাস্টিকের বস্তা টাঙানো, প্রতিদিন সকালে ঐ বস্তা তুলে দেওয়া এবং রাত্রে ঐ বস্তা নামিয়ে দেওয়া 2. রাতে প্রাণীর গায়ে পাটের বস্তা গায়ে জড়িয়ে বেঁধে দেওয়া

	3. শীতকালে প্রতিদিন সকাল ৬ টা থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত গবাদি পশুকে রোদে রাখা ভালো 4. সন্ধ্যার পর পশুকে বাহিরে না রাখা 5. রোগ লক্ষন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ মত চিকিৎসা শুরু করা
সংক্রামক রোগের সংক্রমন বৃদ্ধি পায়	প্রাণীকে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টীকাকরন করিয়ে রাখতে হবে

গাড়োল ভেড়ার রোগব্যাধি ও তার প্রতিকার

গাড়োলের প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা হল পরজীবী সংক্রমণ এবং ডায়রিয়া যার জন্য মেষশাবক এবং প্রাপ্তবয়স্ক গাড়োলের মৃত্যুর হার যথাক্রমে ৩৩.২% এবং ১২.২%, শীতকালে (৩৯%) এবং গ্রীষ্মে (১৯%)। একক, যমজ, তিনটি এবং চারটি করে জন্ম নেওয়া ভেড়ার মৃত্যুর হার যথাক্রমে ১৫.৫%, ৩৬.১%, ৪৪% এবং ৫০%। সাধারণত গাড়োল ভেড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং এদের কোনো টীকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে এদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হল পক্স এবং অ্যামফিস্টোমিওসিস। ভেড়া পালনে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে পালিত পশুগুলিকে রোগ ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত রাখা বিশেষ প্রয়োজন। বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পালন করলে যেমন সঠিক প্রজনন পন্থা অবলম্বন, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা, পরিষ্কার ও শুকনো বাসস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি এমনিতেই এদের রোগ ব্যাধি অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর তুলনায় কম হয়। গাড়োল ভেড়ার কয়েকটি মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকায় ঐসব রোগে সহজে মারা যায় না। তবে কয়েকটি রোগ আছে যেগুলি খুবই মারাত্মক এবং অনেক সময় মহামারী আকার নেয়। তাই ভেড়াপালকদের সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। প্রতিরোধই প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায় এই আপ্ত বাক্য মাথায় রেখে নিয়মিত রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেমন টীকাকরণ, কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা, বাইরে থেকে কেনা বা পাওয়া কোন ভেড়াকে হঠাৎ করে ঘরের ভেড়ার মধ্যে না রাখা (Quarantine Practice), কোন রোগের লক্ষন দেখা দিলে আক্রান্ত ভেড়াটিকে অন্যদের থেকে আলাদা রাখা ও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা - ইত্যাদি কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। সর্বদা স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা দরকার।

রোগের শ্রেণীবিভাগ: কাজের সুবিধার জন্য ভেড়ার প্রচলিত রোগগুলি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে –

ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ, ভাইরাস-ঘটিত রোগ, পরজীবি ঘটিত রোগ, কিছু সাধারণ রোগ ও কিছু জুনোটিক রোগ

ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

আন্ত্রিক বিষক্রিয়া (এন্টারোটক্সিমিয়া)

সংক্রামিত খাদ্য ও জলের মাধ্যমে এই জীবানু শরীরে প্রবেশ করে। গাড়োল ভেড়ার পেটের ভিতর ক্লসট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স টাইপ C ও D নামে এক প্রকার টিটেনাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া থাকে, যারা হঠাৎ করে নতুন জন্মানো ঘাস যখন গাড়োল ভেড়া খায়, তখন ওই ব্যাকটেরিয়াগুলি সংখ্যায় অনেক বেড়ে যায় ও টক্সিন বা বিষ উৎপন্ন করে, যা গাড়োল ভেড়ার আন্ত্রিক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

রোগ লক্ষণ

এই রোগের সাধারন উপসর্গ গুলি হল প্রথমে হঠাৎ করে কিছু না খেতে চাওয়া, পেটের ব্যাথার জন্য ছটফট করে, বার বার শুয়ে গড়াগড়ি খায় নিজের পেটে লাথি মারে, মাথা উল্টো দিকে টান টান করা পেটে ব্যাথা, যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া, পেট ফোলা, শ্লেস্মা সহ (কখনও রক্ত সহ) পাতলা পায়খানা এবং হাঁটাচলায় অসংবদ্ধতা। শেষ পর্যায়ে দাঁতে দাঁত লেগে যায়, পেশি অসার হয়ে যায়, সাথে সাথে টক্সিমিয়া থেকে হার্ট, কিডনি ও লিভার অকেজো হতে পারে ও গাড়োল ভেড়া কোমায় চলে যায়। এই রোগে মৃত্যুর হার বেশি এবং রোগের স্থায়িত্ব ২-৩ দিন। বাচ্চা গাড়োল ভেড়ার সহ্য ক্ষমতা কম হওয়ায় হঠাত মারা যায়। কখনও কখনও রোগের প্রখরতা এতই বেশী যে লক্ষণ দেখা দেওয়ার ১-৩ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণী মারা যেতে পারে।

আন্ত্রিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ

চিকিৎসা ও প্রতিকার

সাধারনত বর্ষার ঠিক আগে ৩ মাস বা তার বেশি বয়সী গাড়োল ভেড়ার এই রোগের টীকা দেওয়া উচিৎ। গর্ভবতী গাড়োল ভেড়াদের বাচ্চা হওয়ার ৩ সপ্তাহ আগে এই রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।

প্রতিষেধক হিসাবে এন্টারোটক্সিমিয়া টীকা (২.৫ মিলি, চামড়ার ভিতর) প্রথম তিন মাস বয়সে দেওয়া হয়, ১৫ দিন পরে একটা। বুস্টার ডোজ দিতে হবে ৬ মাস পর, তারপর থেকে বছরে একবার। রোগ হয়ে গেলে অ্যান্টিবায়োটিক যেমন সালফাগুয়ানিডিন, আমোক্সিসিলিন, প্রভৃতি, ব্যাথার জন্য নোভালজিন, প্যারাসিটামল এবং অম্লরোধক (আন্টিসিড) ব্যবহার করতে হবে।

তরকা/আনথ্রাক্স

রোগ লক্ষণ

নাক মুখ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ

আক্রান্ত গাড়োল ভেড়ার প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর (১০৪-১০৭ ডিগ্রী ফাঃ) হয়, শরীর কাঁপতে থাকে, শ্বাস কষ্ট, ফোসকা, পাতলা পায়খানা এবং হাঁটাচলায় অসংবদ্ধতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। দ্রুত চিকিৎসা শুরু না হলে শরীরের বিভিন্ন ছিদ্রপথে রক্ত বের হয় এবং গাড়োল ভেড়া মারা যায়। অনেক সময় কোন লক্ষণ ছাড়াই গাড়োল ভেড়া মারা যেতে পারে। যদি মনে হয় আথ্রাক্সে গাড়োল ভেড়ার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে নিকটবর্তী প্রানীচিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

নিয়মিত টীকাকরনের মাধ্যমে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যায়। বর্ষাকালের ঠিক আগে আথ্রাক্স প্রবন অঞ্চলে এই ভ্যাক্সিন দেওয়া উচিত। ১ মিলি এনথ্রাক্স টীকা চামড়ার নীচে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর একবার করে পুনরাবৃত্তি করা উচিত। এই রোগে আক্রান্ত গাড়োল ভেড়াদের সাধারনত পেনিসিলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, এম্পিসিলিন ইত্যাদিঅ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করলে কার্যকর হতে পারে।

গলাফোলা

গলাফোলা একটি ব্যাকটেরিয়া (পাস্তুরেল্লা মাল্টোসিডা) ঘটিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এই রোগ গরু ও মহিষের মধ্যে বেশি হলেও গাড়োল ভেড়ার মধ্যেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

রোগ লক্ষণ

গাড়োল ভেড়ার অতিরিক্ত লালা ঝরতে থাকে, খাবার খাওয়া ও জাবর কাটা প্রায় বন্ধ করে দেয়, ঘাড় এবং নিচের চোয়াল ফুলতে থাকে (হাত দিলে থল থল করে) এবং ক্রমশ সারা মুখ ফুলে ওঠে, সেইসঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর (১০৭-১০৮ ফাঃ), ঝিমোতে থাকা, হাটায় অনিচ্ছা, নাক দিয়ে নিঃসরন, কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ত সহ পাতলা পায়খানা হতে দেখা যায়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু না করা হলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গাড়োল ভেড়ার মৃত্যু ঘটে।

গলা ও নিচের চোয়াল ফোলা

চিকিৎসা ও প্রতিকার

প্রথমে ৬ মাস বয়সে এবং পরে প্রতি বছর একবার করে সুস্থ গাড়োল ভেড়াকে টীকা দিলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যেতে পারে। এই টীকা ২ মিলি চামড়ার তলায় ইঞ্জেকশন হিসেবে দেওয়া হয়। রোগ হয়ে গেলে রোগলক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে টেট্রাসাইক্লিন, ফ্লোরোকুইনোলোন, ম্যাক্রোলাইড গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে পারলে আক্রান্ত গাড়োল ভেড়াদের বাঁচানো সম্ভব। রোগলক্ষণ প্রকাশের৮ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই রোগে মৃত্যু হয়। গাড়োল ভেড়াদের ভালো শরীর স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং অজানা পশুদের খামারে প্রবেশ করতে না দেওয়া, এই রোগের আশঙ্কা অনেকখানি কমিয়ে দেয়।

বাদলা (ব্ল্যাক কোয়ার্টার)

বাদলা একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত সংক্রামক রোগ। গরু ও মহিষের সাথে সাথে গাড়োল ভেড়ার মধ্যেও এই রোগের প্রকপ দেখা যায়।

রোগ লক্ষণ

প্রাথমিক অবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত জ্বর (১০৫-১০৭ ডিগ্রি ফাঃ), খোরাতে থাকা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পেছনের পা, কখনও কখনও সামনের পা), পা কাঁপতে থাকা, শ্বাসকষ্ট ও পিঠ বেকে যাওয়া এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। কাধ, নিতম্ব, বুক, পিঠ, ঘার বা অন্য জায়গার মাংসপেশি এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং টিপলে বজবজ বা কচকচে আওয়াজ হয়। ২-৩ দিনের মধ্যে গাড়োল ভেড়ার মৃত্যু হতে পারে।

পিছনের পায়ের মাংসপেশী ফোলা

চিকিৎসা ও প্রতিকার

৬ মাস বয়সের সুস্থ গাড়োল ভেড়াকে প্রথম টীকা দেওয়া উচিৎ। যেসব অঞ্চলে এই রোগের প্রাধান্য আছে, ১০ দিন পড়ে একটি বুস্টার ডোজ দিয়ে প্রতিবছর একবার করে এই টীকাকরন করানো উচিত। রোগের দ্রুত অগ্রগতির কারনে, খুব শীঘ্র চিকিৎসা শুরু না হলে আক্রান্ত গাড়োল ভেড়াকে বাঁচানো মুশকিল। এই রোগের প্রথমের দিকে পেনিসিলিন বা স্ট্রেপ্টোপেনিসিলিন সঠিক মাত্রায় ইঞ্জেকশন দিলে, ভাল ফল লাভ হয়।

ব্রুসেল্লোসিস

একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। জীবাণু সংক্রামিত খাবার, জল, মাঠের ঘাস, সংক্রামিত প্রাণীর নিঃশ্বাস এবং গর্ভপাত হওয়া প্রাণীর মূত্র, রক্তরস, দুধ, সংক্রামিত প্রাণীর বীর্য এই জীবাণুর উৎস।

রোগ লক্ষণ

গর্ভবতী গাড়োল ভেড়ার গর্ভাবস্থার শেষ ভাগে গর্ভপাত এই রোগের প্রধান উপসর্গ। জ্বরের সাথে সাথে গাড়োল ভেড়ার অস্থিসন্ধি ও জনন গ্রন্থি ফুলে যায়। বাচ্চা হওয়ার পড়ে ফুল না পরা এবং গর্ভাশয়ে সংক্রমন বেশিরভাগ গাড়োল ভেড়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে, পুরুষ গাড়োল ভেড়ার বন্ধাত্ব দেখা যায় এবং অণ্ডকোষ ও গাট ফুলে ওঠে।

ভেড়ার গর্ভাবস্থার
শেষ ভাগে গর্ভপাত

চিকিৎসা ও প্রতিকার

ব্রুসেলসিস মানুষের মধ্যেও সংক্রামিত হতে পারে। এই ব্যাকটেরিয়া দুধ, গর্ভপাত হওয়া ভ্রূণ বা ভ্রূণের তরল অংশ, বীর্য এবং প্রস্রাবের মধ্যে উপস্থিত থাকে। তাই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রামিত বস্তু খালি হাতে ছোঁয়া উচিত নয়। ব্রসেলোসিসের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা অনেক খরচ সাপেক্ষ, তাই ছাগলে সাধারনত এই চিকিৎসা হয়না। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা মূল্যবান গাড়োল ভেড়ার মধ্যে সংক্রমন দূর করতে পারে, কিন্তু প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস

সাধারণত দেশীয় পন্থায় খাসীকরনের কিছুদিন পর বাচ্চাটি এই রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রমন স্থল সঠিকভাবে পরিচর্যা না করলে ভেড়া এই প্রাণঘাতী রোগের শিকার মারা যায়। মাটিতে এই রোগের জীবানু থাকে।

রোগ লক্ষণ

আক্রান্ত প্রাণীটির পা ও ঘাড় অন্যান্য অংশ ক্রমশঃ শক্ত হয়ে যায় এবং কাঠের তৈরী প্রাণীর মত অনুভূত হয়। ক্রমে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং প্রাণীটি মারা যায়। মৃত্যুহার প্রতিক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ।

পা, ঘাড় ও অন্যান্য অংশ
ক্রমশঃ শক্ত হয়ে যায়

চিকিৎসা ও প্রতিকার

দেশীয় পদ্ধতিতে খাসীকরন না করা বা একান্তই করতে হলে আয়োডিন জাতীয় এ্যান্টিবায়োটিক লোসন ব্যবহার করতে হবে। খাসীকরনের আগে টিটেনাস টক্সয়েড ইনজকেশন দেওয়া দরকার।

কোলিব্যাসিলোসিস বা আন্ত্রিক রোগ

এই রোগ সাধারণতপূর্ণবয়স্ক গাড়োল ভেড়ার থেকে গাড়োল ভেড়ার ছোট বাচ্চাদের বেশী হয়, এর জন্য অনেক গাড়োল ভেড়ার বাচ্চা মারাও যায়। এই রোগ ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়। এই ব্যাকটেরিয়া সাধারণত জল, দুধ, খাবার, ব্যবহার্য্য বস্তু, এমন কি মানুষ বা প্রাণীর ছোঁয়া দ্বারা বাহিত হয়।

রোগলক্ষণ

আমাশয়, দূর্বলতা, পাতলা পায়খানা
(পায়ুদ্বার, পিছনের পায়ে লেগে আছে)

পাতলা পায়খানা (পায়ুদ্বার, পিছনের পায়ে লেগে থাকে), আমাশয়, দূর্বলতা, ক্ষুধামন্দা, অতিরিক্ত জলবিয়োজনের ফলে চামড়া শুস্ক হয়ে যায়, লোমের চকচকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। জ্বর বা সেপ্টিসেমিয়া হতে পারে। শরীর দুর্বল থাকার জন্য অনেকসময় অন্য রোগও হয়, যেমন আর্থারাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

সাধারনত সংক্রামিত জল ও খাবারের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ায় তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখায়, এই রোগ থেকে বাচার সহজ উপায়। বাচ্চাদের মাটি চাটার প্রবণতা থাকে এবং সেখান থেকেও সংক্রমণ হতে পারে, তাই কম করে মাটির সংযোজন হলেই ভালো। রোগ হয়ে গেলে রোগলক্ষন অনুযায়ী ওষুধ খাওয়াতে হবে। সালফা ও ট্রাইমেথোপ্রিম, সালফাকুইনাজোল, টিনিডাজোল কিংবা নরফ্লক্সাসিন খাওয়ানো যেতে পারে। পাতলা পায়খানা খুব বেশী হলে শিরায় স্যালাইন দিতে হবে অথবা বেশী করে জল (গুড় ও লবণ মেশানো) খাওয়াতে হবে।

গাড়োল ভেড়া ছানার পেটফাঁপা বা পেট ফোলা (টাইপ্যানিটিস)

সাধারণত হঠাৎ করে নতুন কোন কিছু খাবার বা অধিক পরিমানে খাবার, সিম্বোজাতীয় পাতা, বেশী দুধ খেলে পেটের অ্যাসিড উৎসেচকের কার্য্যকারিতার ফলে বায়ু উৎপন্ন হয় এবং তা না বেরোতে পেরে পেটের মধ্যে জমা হয়, এই অবস্থাকে পেটফাঁপা বা পেটফোলা বলে। তাছাড়া কিছু ব্যাকটেরিয়া (*ক্লোসট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স*) খাবার গাঁজিয়ে গ্যাস তৈরি করে। মুক্ত বায়ু বা গ্যাস তেমন সমস্যা নয়, কিন্ত যদি উদ্‌ভুত গ্যাস বুদ্‌বুদে হয়ে থাকে, তা বাইরে বের করা কঠিন, তখন পেট এতো ফুলে যায় যে শ্বাস কষ্ট হয়ে গাড়োল ভেড়া মারাও যেতে পারে।

রোগলক্ষণ

বাঁদিকের পেটের অংশ বেশ ফুলে উঠে, পেটে ব্যথার জন্য পা ছোড়ে, ব্যা ব্যা করে চেঁচায়। অনেকসময় যন্ত্রণায় কম কম করে পেচ্ছাব ও পায়খানা হয়, পেটে গ্যাসের পরিমাণ বেশী হলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসে চাপ পরায়শ্বাসকষ্ট হয় এবং সঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বাঁদিকের পেটের অংশ গ্যাসের চাপে ফুলে উঠেছে

চিকিৎসা ও প্রতিকার

লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্যাস যাতে মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তার জন্য, মুখের কাছে কোন দড়ি বা কাঠের পাতলা অংশ বেঁধে দিতে হবে যাতে ওটা চিবাতে পারে বা অনবরত জাবর কাটতে পারে, তাতে পেটের জমা গ্যাস বেরিয়ে যাবে। অম্বলের ঔষধ (ব্লোটোসিল, ব্লোটোকন, জেলুসিল) ছয় ঘণ্টা অন্তর দুদিন খাওয়ানো যেতে পারে এবং সাথে অ্যান্টিবায়োটিক (এনরোফ্লক্সাসিন, জেন্টামাইসিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন) খাওয়াতে হবে।

কন্টাজিয়াস ক্যাপ্রাইন প্লুরো নিউমোনিয়া (সি সি পিপি)

কন্টাজিয়াস ক্যাপ্রাইন প্লুরো নিউমোনিয়া গাড়োল ভেড়ার শ্বাসতন্ত্রেরঅত্যন্ত সংক্রামক একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ। এই রোগে গাড়োল ভেড়ার মৃত্যুহার প্রায় ১০০%।

রোগ লক্ষণ

প্রাথমিক পর্যায়ে নাক দিয়ে সর্দি ঝরতে দেখা যায়, যা ক্রমশ হলুদ হতে থাকে। শরীরের তাপমাত্রা ১০৪-১০৭ ডিগ্রি ফাঃ পর্যন্ত হতে পারে। ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা বোধ, এবং এক সপ্তাহের মধ্যে গাড়োল ভেড়া মারা যেতে পারে।

নাক দিয়ে সর্দি ঝরতে দেখা যায়, যা ক্রমশ হলুদ হতে থাকে

চিকিৎসা ও প্রতিকার

প্রথমে ৬ মাস বয়সে এবং পরে প্রতি বছর একবার করে সুস্থ গাড়োল ভেড়াকে টীকা দিলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যেতে পারে। এই টীকা ০.২ মিলি কানের ডগায় চামড়ার তলায় ইঞ্জেকশন হিসেবে দেওয়া হয়। রোগ হয়ে গেলে রোগলক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে টেট্রাসাইক্লিন, ফ্লোরোকুইনোলোন, ম্যাক্রোলাইড গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করলে কার্যকর হতে পারে।

ক্লোস্ট্রিডিয়াল ডিজিজ

টিটেনাস রোগে মৃত ভেড়া

এই রোগটি ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি (*Clostridium tetani*) ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট সেইসব ভেড়াগুলির হয়ে থাকে হয়ে থাকে যে ভেড়াগুলি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বসবাস করে। টিটেনাস আক্রান্ত প্রাণীরা প্রতিরোধধর্মী হয়ে ওঠে, পেশীতে খিঁচুনি দেখায দেয় এবং শেষ ভেড়া পর্যন্ত মারা যায়। টিকা দিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। ভেড়ার বাচ্চাদের ৬-৮ সপ্তাহ বয়সে এবং ২-৪ সপ্তাহ পরে একটি বুস্টার ডোজ টিকা দিতে হবে।

পা-পচা রোগ

এই রোগটি উষ্ণ-আদ্র জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে বেশি দেখা দেয়। ব্যাকটেরিয়া, ফিউসো-ব্যাকটেরিয়াম নেক্রোফোরাম (*Fuso-bacterium necrophorum*) এবং ডিচেলোব্যাক্টর নুডোসাস (*Dichelobacter nudosus*) এই রোগের জন্য দায়ী। এই রোগ ভেড়ার পায়ের আঙুলের মধ্যে দেখা দেয় যা চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। যাইহোক, এর ফলে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি দেখা দেয়। একবার এই রোগ জটিল হয়ে উঠলে তা নির্মূল করা খুব কঠিন। এই রোগের ক্লিনিকাল লক্ষণগুলি হল দুর্গন্ধযুক্ত আঙুলগুলোর মধ্যে লালভাব এবং প্রদাহ। পরবর্তী পর্যায়ে পায়ের খুর দুটি আলাদা হয়ে যায়। এই রোগের ফলে ভেড়ার পায়ে লালভাব সৃষ্টি হতে পারে, প্রাণী নড়াচড়া করতে চায় না, দেহের ওজন এবং

প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যায়। এইসব কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পশুর বিক্রয় মূল্য হ্রাস পেয়ে যায়। সংক্রমিত ভেড়াকে পালের মধ্যে আনলে এ রোগ সেখানেও ছড়িয়ে পড়ে। যদি ভেড়ার পায়ের পশম বারবার ছাঁটা না হয় এবং সংক্রমিত ভেড়াকে পালের মধ্যেই রাখা হয় তবে অন্যদের মধ্যে এই রোগ খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে

পায়ের খুরে পচনের ফলে খুর দুটি আলাদা হয়ে যেতে পারে

। ভেড়া প্রতিপালনকারী ব্যাক্তির বুট-জুতো বা তার হাতের মাধ্যমেও এই পা-পচা রোগ ভেড়াদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পালের মধ্যে নতুন ভেড়া নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ৩০ দিনের জন্য যথাযথ কোয়ারেন্টাইন বজায় রাখতে হবে। সুস্থ প্রাণীদের থেকে সংক্রামিত প্রাণীকে আলাদা করা এবং নিরাময় করা সম্ভব নয় এমন প্রাণীদেরকে কসাই করা একটি অতিপ্রয়োজনীয় কাজ।

ক্যাসিয়াস লিম্ফ্যাডেনিটিস

এই রোগটি *Corynebacterium pseudotuberculosis* নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে। এটি লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমকে প্রভাবিত করে এবং এর ফলে লিম্ফ নোড এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিতে ফোড়া তৈরি হয়। ওজন যেমন কমে, তেমনি দুধ ও উল উৎপাদনও হয় হ্রাস কদাচিৎ পশু মারা যেতে পারে। ফোড়াগুলি আক্রমণের বিন্দুতে সমস্ত একটি শরীরে উপস্থিত হয় এবং

লিম্ফ নোড এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিতে ফোড়া তৈরি হয়

রক্ত বা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সিএল রক্তাল্পতা, অ্যানোরেক্সিয়া, ওজন হ্রাস, জ্বর ইত্যাদির কারণ হতে পারে। সংক্রামিত ভেড়ার কাঁচা মাংস খাওয়ার মাধ্যমে বা এর সাথে সংকুচিত হওয়ার মাধ্যমেও মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

দুই ধরনের ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, প্রথমটি হল সিএল সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে টক্সয়েড এবং দ্বিতীয়টি সিডিটি-টিকার সাথে মিলিত হতে পারে।

লিস্টেরিওসিস

এটি লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজিন (*Listeria monocytogenes*) নামক একটি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ এবং এটি চরানোর সময় ভেড়া দ্বারা খাওয়া হয়। এটি গর্ভপাত, সেপ্টিসেমিয়া, অ্যানোরেক্সিয়া, বিষণ্নতা, মুখের পক্ষাঘাত, অত্যধিক লালা এবং তাদের পাশে পড়ে যেতে পারে এবং অনিচ্ছাকৃত চলমান আন্দোলন প্রদর্শন করতে পারে। পেনিসিলিন বা টেট্রাসাইক্লিনের উচ্চ ডোজ এবং তরল এবং ইলেক্ট্রোলাইট দেওয়া চিকিত্সার পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যাকটেরিয়া মলের মাধ্যমে নির্গত হয়। সংক্রমিত ভেড়ার পরিচর্যাকারী ব্যাক্তিরা এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

মুখের পক্ষাঘাত, অত্যধিক লালা ঝরা এবং প্রাণী পাশে পড়ে যায়

অ্যানাপ্লাজমোসিস

(প্যাথোজেন - *Anaplasma mergineta*, ভেক্টর বা এজেন্ট - *Boophilus annulatus*)

উপসর্গ - প্যাথোজেনগুলি লোহিত রক্ত-কণিকার ভিতরে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এর ক্ষতি করে এবং রক্তাল্পতার দিকে পরিচালিত করে। রক্ত-কণিকার মধ্যে থাকার কারণে এগুলিকে সহজে মেরে ফেলা যায় না। এর ফলে দুধ ও মাংস উৎপাদন হ্রাস পায় ।

এঁটুলির মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ায়

চিকিৎসা ও প্রতিকার

সাধারনত এঁটুলির মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ায় তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখায়, এই রোগ থেকে বাচার সহজ উপায়। লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শমত দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। টীকাকরনই এই রোগ প্রতিরোধের অন্যতম উপায়।

রক্তাল্পতার জন্য ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে

ম্যাস্টাইটিস

এটি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে স্তন্যপায়ী গ্রন্থির প্রদাহ। মাস্টাইটিসের কারণে প্রায়ই পালানের ক্ষতি হয়। ম্যাস্টাইটিসের ফলে স্তন্যগ্রন্থি উষ্ণ, ফোলা, বেদনাদায়ক এবং অস্বাভাবিক রঙের দুধ বের হয়।

স্তন্যগ্রন্থি উষ্ণ, ফোলা, বেদনাদায়ক হয়ে উঠে

সংক্রামক নেক্রোটিক হেপাটাইটিস

এটি ভেড়ার মধ্যে ঘটে এবং তীব্র নেক্রোটিক হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে। কারণের ব্যাকটেরিয়া হল *Crostridium novyi*।

ক্ল্যামাইডিওসিস

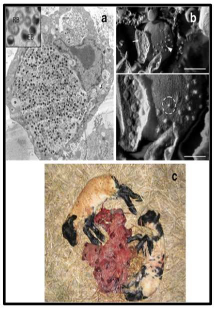

ভেড়ার গর্ভপাত

এটি *Chlamydophila abortus* দ্বারা সৃষ্ট ভেড়ার একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এই ব্যাকটেরিয়া প্লাসেন্টার মাধ্যমে নিঃসৃত হয় এবং নিউমোনিয়া হয়। সুতরাং, গর্ভবতী মহিলাদের রোগাক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শ এড়ানো উচিত। ভেড়ার গর্ভপাতের একটি বড় কারণ এই সংক্রামক রোগ। C abortus দ্বারা সংক্রামিত ভেড়ার বাচ্চাগুলির দ্বারা প্রসব করা হলে তীব্র নিউমোনিয়া হতে পারে; জ্বর, অলসতা এবং শ্বাসকষ্ট হতে পারে; এবং নাক দিয়ে সর্দি পড়তে দেখা যায়।

কিউ-জ্বর

এটি ব্যাকটেরিয়া, *Coxiella burnetti* কারণে হয় এবং লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে গর্ভপাত, গর্ভবতী প্রাণীদের অপরিণত প্রসব। তাই, গর্ভবতী মহিলাদেরও রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শ এড়ানো উচিত।

গর্ভপাত, গর্ভবতী প্রাণীদের
অপরিণত প্রসব ইত্যাদি

ভাইরাস-ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

গাড়োল ভেড়ার পি পি আর

গাড়োল ভেড়ার মারাত্মক সংক্রামক ভাইরাস-ঘটিত রোগ এইটি। এই ভাইরাসটি প্রায় তিরিশ বছর আগে ভারতে প্রবেশ করে এবং দশ বছরের মধ্যে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলায় এটি ব্যাপক এবং মহামারী আকারে দেখা যায়। এতে প্রচুর গাড়োল ভেড়ার মৃত্যু ঘটে যা আজও অব্যাহত আছে। এছাড়া জংলী গাড়োল ভেড়া, ভেড়া বা এই প্রকারের পশুতেও দেখা যায়। এই ভাইরাস শ্বাসেরমাধ্যমে শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। সাধারণতঃ হাট থেকে কেনা কোন রোগগ্রস্থ গাড়োল ভেড়া যদি বাড়িতে বা ফার্মে আনা হয় তার থেকেই এই রোগ হয়। পি পি আর একটি দুটি ছাগলে হয় না, যখন হয় একসাথে অনেক ছাগলে হয় এবং এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগ লক্ষণ

প্রবল জ্বর ও পাতলা

মুখের ভিতর মাড়ি, জিভ ও ঠোঁটে ঘা হয়

ভাইরাস শরীরে ঢোকার চার পাঁচ দিন পরে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাড়োল ভেড়া খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়, প্রবল জ্বর (১০৪-১০৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট) হয়, নাক দিয়ে প্রথমে তরল ও পরে গাঢ় সর্দি বের হয়, খুব শ্বাস কষ্ট এবং কাশি হয়, চোখ লাল হয় এবং চোখ থেকে জল পড়ে, মুখের ভিতর মাড়ি, জিভ ও ঠোঁটে ঘা দেখা যায়, পাতলা পায়খানা হয়, এই সমস্ত লক্ষণ সব সময় একসাথে একই ছাগলে দেখা নাও যেতে পারে। এই রোগে মৃত্যুর হার (৫০-৬০) শতাংশ হতে পারে। তুলনামূলকভাবে বাচ্চা গাড়োল ভেড়ার মৃত্যুর হার বেশী।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

এই রোগ হয়ে গেলে তার কোন চিকিৎসা নেই, তাই যাতে না হয় তার জন্য আগে থেকেই গাড়োল ভেড়াকে টীকাকরণ করাতে হয়।

প্রথমে ৩ মাস বয়সে এবং তারপর প্রতিবছর একবার করে টীকাকরন করানো দরকার। এই টীকা গর্ভবতী ছাগলে না দেওয়াই উচিত। রোগলক্ষন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করা গেলে চিকিৎসা কার্যকর হতে পারে। মৃত গাড়োল ভেড়াকে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, এতে রোগ অন্য সুস্থ পশুতে বাহিত হয় না।

গাড়োল ভেড়ার বসন্ত

বসন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাস জনিত রোগ এবং সারা বাংলা তথা ভারতে গাড়োল ভেড়ার মধ্যে এটি দেখা যায়। কোন রোগগ্রস্থ গাড়োল ভেড়ার স্পর্শ, লালা, শ্লেষ্মা, দুধ দ্বারা সুস্থ ছাগলে এই রোগ বাহিত হতে পারে। বসন্তের ঘায়ের শুকনো চামড়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মাত্রায় এই ভাইরাস থাকে যা সহজেই বাতাস দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য সুস্থ গাড়োল ভেড়ার দেহে সংক্রামিত হয়।

রোগ লক্ষণ

সারা শরীরে চামড়ার উপর বসন্তের গুটি দেখা যায়

সারা শরীরে চামড়ার উপর বসন্তের গুটি দেখা যায়। গুটিগুলো বেশী দেখা যায় জনন ইন্দ্রিয় ও পায়ুর চারপাশে, মুখে, কানে, পেটের নীচে, লেজের নীচে ও দুগ্ধগ্রন্থিতে সেইসঙ্গে প্রবল জ্বর (১০৩- ১০৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট), দুর্বলতাবোধ, ক্ষুধামন্দা, শ্বাস কষ্ট ও নিউমোনিয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত ছোটো গাড়োল ভেড়ার মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

প্রথমে ৩ মাস বয়সে এবং তারপর প্রতিবছর একবার করে সুস্থ গাড়োল ভেড়াকে টীকাকরন করানো দরকার। এই টীকা গর্ভবতী ছাগলে না দেওয়াই উচিত। রোগলক্ষন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে

চিকিৎসা শুরু করা গেলে চিকিৎসা কার্যকর হতে পারে। মৃত গাড়োল ভেড়াকে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, এতে রোগ অন্য সুস্থ পশুতে বাহিত হয় না।

গাড়োল ভেড়ার ওরফ/ কনটাজিওয়াস একথাইমা (মুখে ঘা)

ওরফ একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ যা যে কোন বয়সের গাড়োল ভেড়ার হতে পারে, বিশেষতঃ ঋতু পরিবর্তন ও গর্ভাবস্থাতে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, তথাপি বাচ্চা গাড়োল ভেড়ার হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস বা শরীরের কোন কাটা বা ক্ষতের মাধ্যমে এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে। প্রধানত আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য বা বিরূপ আবহাওয়ার জন্য যেমন ভীষণ গরম বা ভীষণ ঠান্ডার সময় গাড়োল ভেড়ার মুখ ও ঠোঁটের দুদিকে ফোস্কার (পুঁজ যুক্ত) মতো ছোট ছোট গুটি বের হয়। খুব দ্রুত এই রোগ গাড়োল ভেড়া থেকে ছাগলে এমনকি মানুষে ও ছড়িয়ে পড়ে।কোন ফার্মে এই ভাইরাস একবার ঢুকলে বেশ কয়েক বছর ধরে এর প্রকোপ চলতে থাকে।

রোগ লক্ষণ

ভেড়ার মুখের চামড়ার চারিদিকে ফোস্কার (পুঁজযুক্ত) মতো ছোট ছোট গুটি বের হয়

গাড়োল ভেড়ার মুখের চামড়ার চারিদিকে ফোস্কার (পুঁজ যুক্ত) মতো ছোট ছোট গুটি বের হয়। গাড়োল ভেড়ার ঠোঁট, মুখ, কান, যোনিদ্বার, বাঁট, শুক্রাশয়, পায়ের খুরের ফাঁকে, খুজলির মতো হয়। মুখের বাইরে ও ভেতরে, উপরে ও নীচে, ঘা হবে যা অনেকটা বসন্তের গুটির মতো দেখতে এবং বেড়ে গিয়ে পুঁজ হতে পারে। এমতাবস্থায় পোকাও হতে পারে। ব্যথার জন্য খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং দূর্বল হয়ে যাবে। না-খেয়ে থাকার জন্য অনেক সময় ছোট বাচ্চা মারাও যায়। এই অবস্থা ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। ধীরে ধীরে ঘা শুকিয়ে গেলে মরা মাংস ওঠতে থাকে। এতে বড় গাড়োল ভেড়া সাধারণত মরে না, তবে ওজন কমে যায়, দুধের পরিমান কমে যায়, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, অনেক সময় নিউমোনিয়াও হতে পারে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

মুখের ক্ষত গুলি পটাশজল বা আয়োডিন দিয়ে পরিস্কার করতে হবে এবং তার পরে মলম (হিম্যাক্স) লাগাতে হবে যাতে মাছি বসতে না পারে। ঘায়ে মাছি বসলে পোকা (ম্যাগট) হতে পারে। শুকনো অবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিক মলম (নিওমাইসিন, ব্যাক্টিরাসিন, পলিমিক্সিন বি) লাগাতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হবে। এই চিকিৎসা ৫-৭ দিন করতে হবে। এই রোগের কোন টীকা নেই। গাড়োল ভেড়ার ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে হবে। তবে আক্রান্ত গাড়োল ভেড়ার ঘায়ের মরা চামড়াগুলিকে গুঁড়ো করে ১% সাস্পেনশন তৈরি করে তা ৫০% গ্লিসারল স্যালাইনে মিশিয়ে টীকা তৈরি করা হয় এবং এই টিকা সুস্থ গাড়োল ভেড়ার উরুর ভিতরের দিকে চামড়ার ওপর আঁচড় কেটে প্রয়োগ করা হয়। টীকা দেবার এক সপ্তাহ পর ওই জায়গায় লালচে ফুসকুড়ি দেখা দিলে টীকা ঠিকমতো দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। রোগ শুরু হয়েছে এমন খামারে ভালো গাড়োল ভেড়াকে এই প্রতিষেধক টীকা দেওয়া যায়। এই টীকার অনাক্রমতা প্রায় ২-৩ বছর স্থায়ী হয়।

এঁষো বা খুরাই

গরুর মত ছাগ ও ভেড়ার ও এই রোগ হয়। এটি একটি ছোঁয়াচে ভাইরাসিঘটিত রোগ। বাচ্চারা এই রোগে আক্রান্ত হলে কোন লক্ষন ছাড়াই হঠাৎ মারা যায়। বড়দের ক্ষেত্রে সাধঅরণত প্রাণঘাতী না হলেও উৎপাদন ভীষণরকম কমে যায়।

রোগের লক্ষণ

জ্বর, জিভে, ঠোঁটে, মাড়িতে ও পায়ের ক্ষুরের ফাঁকে ঘা দেখা যায়। মুখ দিয়ে লালা ঝরে কিছু খেতে পারে না।

জিভে, ঠোঁটে, মাড়িতে ঘা

পায়ের ক্ষুরের ফাঁকে ঘা দেখা যায়

চিকিৎসা ও প্রতিকার

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত মুখের এবং ক্ষুরের ক্ষত গুলিতে পটাশজল বা আয়োডিন দিয়ে পরিস্কার করতে হবে এবং তার পরে মলম (হিম্যাক্স) লাগাতে হবে যাতে মাছি বসতে না পারে। ঘায়ে মাছি বসলে পোকা (ম্যাগট) হতে পারে। শুকনো অবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিক মলম (নিওমাইসিন, ব্যাক্টিরাসিন, পলিমিক্সিন বি) লাগাতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হবে। এই চিকিৎসা ৫-৭ দিন করতে হবে। ছয় মাস ছাড়া টীকাকরণই একমাত্র এই রোগ প্রতিরোধের উপায়।

জলাতঙ্ক

জলাতঙ্ক একটি ভাইরাস ঘটিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা মানুষ এবং প্রাণীর উভয়েরই হয়। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত বা বাহক প্রাণী কামড়ালে বা তাদের লালারস, ব্রেন বা স্পাইনাল কর্ডের রস শরীরের ক্ষতস্থানের মাধ্যমে সুস্থ প্রাণীর শরীরে ভাইরাস প্রবেশ করে। অনেকসময় আক্রান্ত প্রাণীর দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, তাদের বাহক প্রাণী বলে। তাই আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ বাহক প্রাণী কামড়ালেও এই রোগ হতে পারে।

রোগ লক্ষণ

অসংলগ্ন চালচলন, উত্তেজিতভাব, চোখ লাল হওয়া, মুখ দিয়ে অনবরত লালা পড়া, অস্থিরভাব, অকারণে আওয়াজ করা, গলার স্বাভাবিক আওয়াজ বদলে যাওয়া, খিঁচুনি, নিচের চোয়ালের প্যারালাইসিসের জন্য চোয়াল ঝুলে যায়, কোনকিছু খাদ্যদ্রব্য এমনকি জলও খেতে পারে না। তাই এই রোগকে জলাতঙ্ক বলে।

অসংলগ্ন চালচলন, উত্তেজিতভাব

প্যারালাইসিসের জন্য চোয়াল ঝুলে যায়

চিকিৎসা ও প্রতিকার

জলাতঙ্ক রোগ হয়ে গেলে বাঁচার কোন উপায় নেই। প্রতিষেধক হিসাবে এই রোগের দুই ধরনের টীকা ব্যাবহৃত হয়। যেমনঃ (১) আক্রান্ত প্রাণীতে কামড়ানোর আগে (Prebite Vaccination) এবং (২) আক্রান্ত প্রাণীতে কামড়ানোর পড়ে (Postbite Vaccination)। তাই গাড়োল ভেড়াকে জলাতঙ্ক সন্দেহজনক প্রাণীতে (প্রধানত কুকুর) কামড়ালে প্রথমেই যে প্রাণীটি কামড়েছে তার ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে, সাধারণত আক্রান্ত প্রাণী ১০ দিনের মধ্যেই মারা যায়। কামড়ানোর যত দ্রুত সম্ভব ক্ষত জায়গাটিকে বেশী ক্ষারযুক্ত সাবান (কাপড় কাচা সাবান) দিয়ে জোরে জোরে জলের ঝাপটা দিয়ে বার বার ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর ৭০% এলকোহল বা ২% পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবন দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ক্ষত স্থানটিকে খোলা রাখলে ক্ষত তাড়াতাড়ি সেরে যায়। যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিষেধক টীকা ও ক্ষত নিরাময়ের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হবে। এই চিকিৎসা ৫-৭ দিন করতে হবে।

মুখের ঘা

এটি একটি ভাইরাসজনিত চর্মরোগ এবং লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ঠোঁট, নাক মুখ বা নীচের পায়ের খুর ও ত্বকের সংযোগস্থলে ফোসকা দেখা, সবশেষে অন্যান্য রোগের প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অনাহারে মৃত্যু। তারা তাদের বাচ্চাকে দুধ নিতে দেয় না। সংক্রমণের এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে রোগলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এই রোগ সংক্রামিত প্রাণী, খাদ্য, সরঞ্জাম, ইত্যাদির সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে অর্জিত হয়। বাসস্থানে মাছির আক্রমণ ঠেকাতে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ঠোঁট, নাক মুখে ফোসকা

রিফট-ভ্যালি ফিভার

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে গর্ভপাত হয়

এটি ভেড়ার খুব তীব্র রোগ। হেপাটাইটিসের ফলে অল্প বয়স্ক ভেড়ার বাচ্চাদের মৃত্যু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে গর্ভপাত হয়। এটি ইনফ্লুয়েঞ্জার (influenza) খুব কাছাকাছি, এটি মাইট এবং পোকামাকড় এবং কর্নিয়ার মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে রোগের বিস্তার হয়। রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে মানুষের সংক্রমণ ঘটতে পারে। উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে বমি, মুখের চারপাশে জড়ো হওয়া এবং আলোক সংবেদনশীলতা, ফলস্বরূপ মাথা ব্যাথা হয়।

নীল জিহ্বা রোগ

এটি ভেড়ার একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাল রোগ, যা জ্বর, মুখের ক্ষত, খোঁড়া হয়ে যাওয়া এবং দুর্বলতা দ্বারা প্রকাশিত হয়।

মুখের ক্ষত ও জীভ নীল হয়ে যায়

স্ক্র্যাপি

এটি ভেড়ার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং এটি একটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট। লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে শুষ্ক পশম এবং রুক্ষ ত্বক, পশম ক্ষয়, দাঁত পিষে যাওয়া এবং অস্থিরতা।

পশম শুষ্ক এবং রুক্ষ ত্বক হয়ে যায়

পালমোনারি অ্যাডেনোমাটোসিস

এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ, যেমন ভেড়ার নিউমোনিয়া এবং রেট্রো ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট।

ভেড়ার বাচ্চার নিউমোনিয়া

মাইকোপ্লাজমোসিস

মাইকোপ্লাজমা মাইকোয়েডস এবং এম. অ্যাগালাক্টেই নিউমোনিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। ক্ষুদা-মন্দা (অ্যানোরেক্সিয়া), চোখ লাল হয়ে যাওয়া, শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়া (ডিসপনিয়া), কাশি, নড়াচড়া করতে অনিচ্ছুক, নাক দিয়ে ফেনাযুক্ত তরল, পেটে অ্যাডেনা এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। চিকিত্সার জন্য অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বা স্টেপটোমাইসিন ব্যবহার করা যেতে পারে। *M. agalactae* একটি গুরুতর বাত, চক্ষুরোগ এবং গর্ভপাত ঘটায়।

চোখ লাল হয়ে যায়

পরজীবি ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

যদিও গাড়োল প্রজাতি ভেড়ার হিমোঙ্কাস জাতীয় গোলকৃমির বিরুদ্ধে প্রকৃতিগতভাবে বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তবু বলা যায় কৃমি বা পরজীবি ঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব ভেড়া পালনের অন্যতম মূল সমস্যা। পরজীবি বা কৃমি ঘটিত রোগ অজান্তে প্রাণীর শরীরে বাসা বাঁধে এবং ধীরে ধীরে গৃহপলিত পোষ্যটির শরীর ক্ষয় করে তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করে। এইজন্য কৃমি ঘটিত রোগের অপর-নাম নীরব হত্যাকারী (Silent Killer)।

তিওয়ারি এবং অন্যান্য (২০১৭) ভেড়ার পরজীবী সংক্রমণ সহ গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল রোগের ক্ষেত্রে রক্তের জৈবরাসায়নিক পরিবর্তনগুলি অধ্যয়ন করেছেন। গবেষণায় নরমোসাইটিক হাইপোক্রোনিক রক্তাল্পতা রোগে সংক্রামিত ভেড়ার লোহিত রক্তকণিকার সূচকগুলি প্রকাশ করা হয়েছে কারণ গড় রক্তকণিকার

পরিমানে (MCV) কোন পরিবর্তন হয়নি কিন্তু গড় রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের (McHc) উল্লেখযোগ্য হ্রাস পরিলক্ষিত হয়েছে। নিউট্রোফিলিয়া, লিম্ফোসাইটোসিস, মনোসাইটোসিস এবং ইওসিনোফিলিয়ার কারণে মোট লিউকোসাইট গণনা উল্লেখযোগ্য লিউকোসাইটোসিসকে প্রকাশ করেছে। এরিথ্রোসাইট অবক্ষেপন হারে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। পরজীবীর মলের নমুনাগুলি স্ট্রংগাইলস, *Strongyloides sp., Trichuris spp.* এবং *Eimeria spp.* এর সংক্রমণকে প্রকাশ করে।

ডোবা এবং অন্যান্য (২০২৪) ভেড়ার বিভিন্ন GI পরজীবী সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন যে ভেড়াগুলি *Strongyloides papillosus, Ostertergia* spp., *Monezia expansa, Dictiocaulus filoria, Nematodirus spathiger, Haemonchus contortus, Cooperia* spp., *Trichostrongylus axei, Eimeria* spp., *Trichuris ovis* - এ আক্রান্ত। তাদের ব্যাপকতা ছিল জিআই প্যারাসাইটোসিস (70.86%), পালমোনারি প্যারাসাইটোসিস (54.20%), ফ্যাসিওলোসিস (50.00%), টিক ইনফেকশন (8.30%), ফ্লিস (8.30%), স্ক্যাবিস (12.50%) এবং ব্যাবেসিয়া সংক্রমণ (29.20%)।

বাহ্যিক পরজীবি ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

এটুলি, উকুন ইত্যাদি ভেড়ার চামড়া বা পশমের মধ্যে বাসা বাঁধে এবং ক্রমাগত রক্ত শোষন করে প্রাণীটিকে দুর্বল করে তোলে। তাছাড়া এরা মানুষের ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গির মত, থাইলেরিয়া বা ব্যাবোসিয়া রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

প্রতিরোধের উপায়

এক প্রাণী থেকে অপর প্রাণীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে, দেখা মাত্র প্রাণীচিকিৎসকের পরামর্শমত চিকিৎসা শুরু করা দরকার। সঠিক পুষ্টি ও নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে বাহ্যিক পরজীবির আক্রমন থেকে ভেড়াকে রক্ষা করা যায়।

খোসপাঁচড়া বা কঞ্চ (মেনজ)

ইহা একপ্রকার চর্মরোগ যা খুব সূক্ষ্ম এক ধরনের পরজীবী (মাইট) দ্বারা হয়ে থাকে। নানা রকমের মাইট (সার্কোপ্টিক সরোপটিক, কোরিওপিটিক মেনজ, সার্কোপ্টাস স্ক্যাবিয়েই ভার ক্যাপ্রি, স্রোপটিকে কানিকুলি, প্রভৃতি) গাড়োল ভেড়াকে আক্রান্ত করে। যে কোন বয়সের গাড়োল ভেড়ার এই রোগ হতে পারে।

রোগ লক্ষণ

এই রোগে গাড়োল ভেড়ার চামড়া মোটা ও খসখসে হয়ে যায়, মাথায়, ঘাড়ে, কানের গোড়ায়, নাকে, ঠোঁটে, দেহের চুলহীন চামড়ার অংশে ভীষণ চুলকানি হয়। অনেকদিন ধরে এই রোগে ভুগলে পুরো লোমহীন চামড়া (আলোপেসিয়া) বেরিয়ে আসে। অনেকসময় ক্রমাগত কান চুলকানোর ফলে হেমাটোমা বা কানের ক্যাংকারও হতে পারে। কখনও কখনও কানের পুরনো ক্যাংকার মাথার সেরাবেলাম নষ্ট করে দেয়, তখন আর গাড়োল ভেড়া বাঁচানো সম্ভব নয়।

সার্কোপ্টিক খোস-পাচড়া

খোস-পাচড়া জনিত সমস্যা দেখা যায়

ভেড়াগুলি খোস-পাচড়া জনিত রোগে ভোগে যা অকালে দেখা দেয় এবং এগুলি কালো মুখের সৃষ্টি করে। গুরুতর সংক্রমণের ক্ষেত্রে, ভেড়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা পুরো শরীর প্রভাবিত হতে পারে কিন্তু পশম সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। এটি প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা যায়, এটি মাইট -এর কামড় থেকে সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখায় এই রোগ থেকে বাচার সহজ উপায়। রোগ হয়ে গেলে রোগলক্ষন অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার হবে। চিকিৎসার জন্য বেঞ্জাইল বেঞ্জোয়েট (আস্কাবিওল) মলম, ইনজেকশন ইভারমেকটিন @০.২-০.৪ µg/ কেজি চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং ১৫ দিন পর পুনরায় একবার ইনজেকশন করতে হবে।

সোরোপটিক খোস-পাচড়া

উপসর্গ- ভেড়ার পুরো শরীরে ফোড়া দেখা দেয় যেখানে পরবর্তীতে ইনফেকশন হয়ে যায়। যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে ভেড়া মারা যেতে পারে।

ভেড়ার ওজন, মাংস, দুধ ও পশমের উৎপাদন হ্রাস পায়।

ভেড়ার পুরো শরীরে ফোড়া দেখা দেয়

চিকিৎসা ও প্রতিকার

লাইম-সালফার কীটনাশক, Flumethrin@2mg/kg বা Ivermectin দিয়ে পুরো শরীর ভিজিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও সংক্রামিত ভেড়ার দেহে ম্যাক্রোসাইক্লিক ল্যাকটোনের OP স্প্রে করা যেতে পারে। চিকিৎসা করা ভেড়াগুলিকে চিকিৎসা না করা ভেড়াগুলি থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। এটি অত্যন্ত সংক্রামক। ক্ষত থেকে রক্ত ও রক্তরস বের হলে মাইট তাদের মুখ দিয়ে ভেড়ার চামড়া ছিদ্র করে। শরীরের ক্ষতিগ্রস্থ অংশগুলি পিছনের দিকে বা পশ্চাদদেশেই হয়ে থাকে। সংক্রমিত প্রাণী ক্রমাগত নিজেদেরকে কামড়ায় এবং গা ঘষতে থাকে। গুরুতরভাবে সংক্রমিত প্রাণীগুলি দুর্বল হয়ে মারা যায়। মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষা করার সময় মাইটগুলি দৃশ্যমান হয়।

কোরিওপটিক খোস-পাচড়া

উপসর্গ- মাইটগুলি হোস্ট অর্থাৎ ভেড়ার ত্বকে প্রবেশ করে না, বাইরে থাকে এবং ত্বকের মৃত কোষগুলি খায়। আক্রান্ত ভেড়াগুলি বারবার মাটিতে পা ঠোকে, বিশেষ করে রাতের বেলা। এছাড়াও তাদের পশম ঝরতে থাকে।

ভেড়ার পশম ঝরে পড়ে

চিকিৎসা ও প্রতিকার

চুন-সালফার বা আইভারমেকটিন স্প্রে করা এবং শরীরের প্রভাবিত অংশ থেকে পশম ছাঁটাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ভেড়ার ত্বকের ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড এর সাহায্যে সেগুলির পচন ঘটানোর পরে মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষা করা হলে মাইটগুলি দৃশ্যমান হয়। ELISA পরীক্ষা *Psoroptes ovis* নামক মাইট-এর অ্যান্টিবডি শনাক্ত করে। এটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

ভেড়ার মস্তিষ্কে ম্যাগট

লার্ভিপারাস মাছি গাড়োলের নাসারন্ধ্রে শুককীট জমা করে যা পরে সাইনাস অঞ্চলে চলে যায়, এবং ক্রমাগত অনুনাসিক স্রাব ঘটায় ও অনুনাসিক পথকে অবরুদ্ধ করে।পরজীবী ভেড়ার স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে যেমন ভেড়ার বৃদ্ধি, ওজন, দুধ, মাংস ও উলের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয় এবং মৃত্যুর হারও বাড়িয়ে দেয়। এটি প্রায়ই মানুষকে আক্রমণ করে যার ফলে মানুষের বিভিন্ন চক্ষুরোগ হয়।

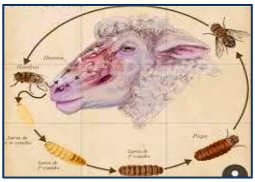

মাছি নাসারন্ধ্রে শুককীট জমা করে

রোগ লক্ষণ

ভেড়া ক্রমাগত জোরে জোরে মাথা নাড়ায় বা মাটিতে নাক ঘষে এবং এর কারণে তাদের আঘাত লাগে। লার্ভার স্থানান্তর অনুনাসিক ঝিল্লিতে জ্বলন সৃষ্টি করে এবং এইভাবেই গৌণ সংক্রমণ ঘটে। হাঁচি, শ্বাসকষ্ট, নাক দিয়ে রক্তপাতও হতে পারে, ভেড়া দুর্বল হয়ে মারা যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত ক্লোসান্টেল নাইট্রোক্সিনিল এবং রাফক্সিনাইড ভেড়াকে খাওয়ানো বা ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে।

ভেড়ার রক্ত শোষণকারী পরজীবী

বাদামী, লোমশ মাছি যা উকুনের মত দেখতে

একটি বাদামী, লোমশ মাছি যা একটি টিক সদৃশ দেখতে। এই ডানাবিহীন মাছি প্রায় ৪ থেকে ৬ মিলি মিটার লম্বা এবং এটির একটি ছোট মাথা আছে। এটি ব্যাপকভাবে ভেড়ার দেহে প্যারাসাইট ছড়িয়ে দেয়। এটি ভেড়ার ক্ষতে ডিম পাড়ে। লার্ভা পিউপাতে রূপান্তরিত হয় এবং তারপর তা পূর্ণবয়স্ক হয়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক মাছিগুলি ভেড়ার পশমের মধ্যে বাস করে এবং রক্ত শোষণ করে। এই মাছির মল ভেড়ার পশমকে দাগযুক্ত ও ক্ষতি করে ফলে পশম বাজার মূল্য হারায়। ভেড়ার শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণকে আকর্ষিত করে। প্রাপ্তবয়স্ক মাছিগুলি সারা জীবন হোস্ট বা ভেড়ার শরীরে বাস করে এবং ট্রাইপানোসোমার ও Blue Tongue Disease (BDT) এর বায়োলজিক্যাল ভেক্টর হিসেবে কাজ করে। প্রাপ্তবয়স্ক মাছিগুলি দেখতে হয় ধূসর বাদামী বর্ণের, ১/২ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া চামড়াযুক্ত, চ্যাপ্টা বস্তার মতো পেট কোঁকড়ানো পশম দ্বারা আবৃত, এরা ৬ মাস বাঁচে, এই সময়ের মধ্যে স্ত্রী মাছিগুলি প্রায় ১৫ টি ডিম পাড়ে। প্রতি বছর এই মাছিদের বেশ কয়েকটি প্রজন্ম চলতে থাকে, প্রাপ্তবয়স্ক মাছিগুলি ১/৪ ইঞ্চি লম্বা,

ডিম্বাকৃতি, পা বিহীন জীবন্ত ম্যাগট জন্ম দেয়, যেগুলো পূর্ণ বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাদের দেহে পুষ্ট হয়। জন্মের কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদের ত্বক বাদামী বর্ণের হয়ে যায়।

রোগ লক্ষণ

পিউপা খোলক থেকে বের হওয়ার পর প্রাপ্তবয়স্ক মাছিরা ভেড়ার ত্বকের উপর হামাগুড়ি দেয় এবং মুখের সাহায্যে রক্ত শোষণ করে যার ফলে রক্তাল্পতা সৃষ্টি হয়। এসবের ফলে ভেড়া প্রায়ই নিজেদেরকে কামড়ায়, আঁচড়ায় এবং গা ঘষে, এর ফলে পশমের ক্ষতি হয় ও তার মূল্য কমতে থাকে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

বসন্ত কালে কীটনাশক পাউডার ভেড়ার সারা শরীরে মাখাতে হবে । কেড মাছির ব্যাপক সংক্রমণের ক্ষেত্রে, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সকালে স্প্রে করতে হবে এবং শুকানো পর্যন্ত ভেড়াকে বাইরে রাখতে হবে। পশুদের কেড মাছির হাত থেকে মুক্ত রাখতে বছরে অন্তত একবার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। একবারে ৫-১০ টির বেশি ভেড়ার চিকিৎসা করা উচিত নয়। বসন্তকালীন ব্লো ফ্লাই বা মাছির সিজনের আগে ভেড়ার শরীরের নোংরা জায়গাগুলি ক্লিপিং করতে হবে এবং কীটনাশক স্প্রে করে ভালো ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

ভেড়ার উকুন

ভেড়ার কেড নামক মাছির মতো এটির প্রাদুর্ভাব খুব বেশি নয়। ক্ষতিগ্রস্ত পশমগুলো জীর্ণ ও নিম্নমানের হয়ে যায়। অতিরিক্ত উকুন ব্যাপক রক্তাল্পতা সৃষ্টি করে এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগের জন্য সংবেদনশীল করে তোলে ভেড়াকে। উকুনের ডিমগুলো ভেড়ার পশমের সাথে লেগে থাকে। প্রাণীর শরীর ছাড়া, পুষ্টির অভাবে, অপরিণত এবং প্রাপ্তবয়স্ক দুর্বল উকুনগুলি বেশি দিন বাঁচতে পারে না।

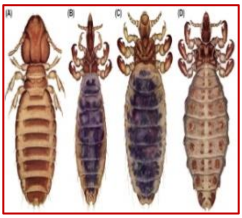

ভেড়ার উকুন

রোগ লক্ষণ

এই লাউস বা উকুন ভেড়ার পশমের ক্ষতি করে, রক্ত চুষে খায়, ত্বকে জ্বলন ও চুলকানি সৃষ্টি করে যার কারণে ভেড়া তার শরীর শক্ত বস্তুর সাথে ঘষে এবং তার ফলে ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ভেড়ার ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয় এবং তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। শীতকালে এই রোগ বেশি হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত উকুননাশক পাউডার ভেড়ার সারা শরীরে মাখাতে হবে। ভেড়ার শরীরের নোংরা জায়গাগুলি ক্লিপিং করতে হবে এবং কীটনাশক স্প্রে করে ভালো ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

উল ম্যাগট

ব্লো ফ্লাই বা মাছির লার্ভা মূলত নোংরা ময়লাযুক্ত পশমের আশেপাশেই বাস করে। এই মাছির আক্রমণে মারাত্মক রকমের রক্তাল্পতা হয়ে থাকে, যার ফলস্বরূপ অন্যান্য রোগ হবার সম্ভবনা বেড়ে যায়।

উল ম্যাগট সৃষ্টিকারী মাছি

উল ম্যাগট আক্রান্ত ভেড়া

চিকিৎসা ও প্রতিকার

বসন্তকালীন মাছি বা ব্লো ফ্লাই এর সিজনের আগে ভেড়ার শরীরের নোংরা জায়গাগুলির পশম ছাঁটা এবং কীটনাশক স্প্রে করা প্রয়োজন। ম্যাগট এর উপদ্রব দেখা দেওয়ার পরে কীটনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

চিউইং লাইস

এই উকুন *Psoroptes ovis* নামক মাইট এর সাথে যৌথভাবে গাড়োল ভেড়াকে আক্রমণ করতে পারে। রোগলক্ষণ দেখা মাত্র প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত টপিক্যালি সিন্থেটিক পাইরেথ্রাম প্রয়োগ করা হয়, তবে সম্পূর্ণরূপে পশম ছাঁটা ভেড়ার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা সীমিত।

ভেড়ার উকুন

উপরে উল্লিখিত টিক বা এঁটুলি সংক্রান্ত রোগগুলি ছাড়াও, আরও কয়েকটি এঁটুলি রোগ রয়েছে যা ভেড়াকে আক্রমণ করে (গাড়োল সহ) সেগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি জ্বর, রক্তাল্পতা এবং কিছু অন্যান্য রোগের ভেক্টর বা এজেন্ট হিসাবে কাজ করে।

ভেড়ার নাইরোবি রোগ

এটি একটি অ-সংক্রামক, উকুন-বাহিত ভাইরাল রোগ যা পাকস্থলী ও অন্ত্রে তীব্র রক্তক্ষরণজনিত প্রদাহ এবং শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা দ্বারা লক্ষিত হয়। *Rhipicephalus appendiculatus* একটি ভেক্টর হিসাবে কাজ করে এই রোগে।

ভেড়ার উকুন

আক্রান্ত প্রাণী

রোগের নাম	প্যাথোজেন	বাহক (ভেক্টর বা এজেন্ট)	উপসর্গ
ভেড়া টুলারেমিয়া	*Theileria parva/Theileria annulata*	*Rhipicephalus sp.*	উচ্চ জ্বর এবং দুর্বলতা
ক্রিমিয়ান-কঙ্গো হেমোরেজিক ফিভার	নাইরো ভাইরাস	*Rhipicephalus marginatum*	মাথাব্যথা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, মৃত্যু
লাউপিং রোগ	ভাইরাস	*Rhipicephalus appendiculatus*	এনসেফালাইটিস, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা, মৃত্যু

আভ্যন্তরীন পরজীবি ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

বিভিন্ন ধরনের কৃমি যেমন গোলকৃমি (Round Worm) চ্যাপ্টাকৃমি (Amphistome) বা ফিতাকৃমি (Tapeworm) সাধারণত ভেড়ার পাকস্থলী সহ পেটের নাড়ীতে (Intestine) এর বিভিন্ন স্থানে বাসা বাঁধে এবং পুষ্টিরস শোষণ করে আক্রান্ত প্রাণীটিকে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে নিয়ে যায়। টিনিয়া নামক ফিতাকৃমি ভেড়ার মস্তিকে পর্যন্ত বাসা বাঁধতে পারে এবং আক্রান্ত প্রাণীটি ক্রমাগত একদিকে ঘুরতে থাকে। আদ্র ও জলে ডোবা জায়গায় কৃমির উৎপাত তুলনামূলকভাবে বেশী হয়।

গোলকৃমি

চ্যাপ্টাকৃমি

ফিতাকৃমি

রোগের লক্ষণ

আভ্যন্তরীন পরজীবি আক্রান্ত ভেড়ার পেটের গন্ডোগোল, বদহজম, পাতলা পায়খানা, ক্ষুধামন্দ এবং রক্তাপ্লতা দেখা যায়। আক্রান্ত ভেড়া আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকে। পা-গুলি সরু এবং পেটটি বড় ও ঝুলে যায়। ওজন কমতে থাকে। হাঁটা চলার ক্ষমতা কমে যায়। অত্যাধিক কৃমির প্রাধান্য হলে অনেক সময় মলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কৃমি বেরিয়ে আসে। দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা পিচকিরির মত বের হয়। হাল্কা জ্বর থাকে। রক্তশূন্যতার কারণে ক্রমে দূর্বল হয়ে মারা যায়। বাচ্চা ভেড়া সাধারণত গোলকৃমি ও ফিতাকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং দূর্বল হয়ে মৃত্যু হয়।

গোলাকার কৃমি

বিভিন্ন ধরনের গোলাকার কৃমির মধ্যে রয়েছে ট্রাইকোস্ট্রংগাইলাস কলুবিফর্মিস (*Trichostrongylus colubiformis*), হেমনকাস কনটর্টাস (*Haemonchus contortus*) এবং টেলোডোরসাজিয়া উরকুমসিনক্টা (*Telodorsagia urcumcincta*) যার মধ্যে শেষেরটি সবচেয়ে বিপজ্জনক। ক্লিনিকাল লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যানিমিয়া, এডিমা (ত্বকের নীচে তরল জমা হওয়া), প্রোটিন হ্রাস এবং মৃত্যু। অনেকসময় এসবের কারণে ভেড়া দুর্বল ও অলস হয়ে যায়।

স্ট্রংগিলইডিয়াসিস

এই রোগটি একটি বৃত্তাকার কৃমি (আন্তঃপরজীবী) দ্বারা হয়। এতে ডায়রিয়া হয়। বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্রতার বৃদ্ধি এই ধরনের আন্তঃপরজীবী (নিমাটোড) ডিমের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ৬৬.৮৮% পরজীবী শরীরে থাকলে তা ভেড়াকে রোগগ্রস্ত করে তুলতে পারে।

হিমনকোসিসস

এটি একটি প্যাথোজেনিক গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল নিমাটোড। প্রাপ্তবয়স্ক নিমাটোডগুলি ভেড়ার মিউকোসা থেকে রক্ত শোষণ করে, ফলে তা মাংস, দুধ ও চামড়া উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি ঘটায়। এই রোগের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যানিমিয়া, এডিমা

এবং রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যু। এটি গ্রীষ্মকালীন সময়গুলিতে উষ্ণ এবং আর্দ্র জলবায়ুতে ভেড়াকে সংক্রামিত করে এবং পশুর মৃত্যু ঘটায়। এটিতে উচ্চমাত্রার জিনগত পরিবর্তনশীলতা রয়েছে এবং হোস্টের নির্দিষ্টতা ও সংবেদনশীলতা কম রয়েছে। একই সময়ে এটির anthelmintics ওষুধ প্রতিরোধের উন্নয়নশীল ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি তার জৈবিক এবং পরিবেশগত অভিযোজনক্ষমতার কারণে বেঁচে থাকতে পারে। পরজীবী গোলকৃমির মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফামাচা নামে একটি সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক গর্ভাবস্থায় টক্সোপ্লাজমোসিস রোগ দেখা দেয়।

ফুসফুসের কৃমি

ডিকটিওকলাস ফিলেরিয়া (*Dicktyocaulus filaria*) ভেড়ার ফুসফুসের একটি সাধারণ রোগ এবং এর উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কাইটিস। এটি ভেড়ার বাচ্চাদের মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যায় এবং এটি একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা।

ফ্যাসিওলোসিস

লিভার ফ্লুক (সমতল, পাতা আকৃতির কীট), *Fasciola hepatica* ইত্যাদি রোগ প্রাপ্তবয়স্ক ভেড়ার পিত্ত নালীতে দেখা যায়। এটি শামুকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যা ঘন ঘন রোগের বৃদ্ধি ঘটায়। এটি টিস্যুর ক্ষতি করে। শামুকের সংক্রমণ গ্রীষ্মকালে (মে-জুলাই) হতে পারে এবং শীতকালে সংক্রমণ কম দেখা যায়। শামুক বসন্তকালে ভেড়ার পালের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সংক্রমণ ঘটায়। এই রোগটি তিনটি ক্লিনিকাল আকারে দেখা যায় তীব্র, উপ-তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ফ্যাসিওসিস মেটাসারকারিয়ার অবস্থা (সংক্রামক লার্ভা পর্যায়)। রোগের লক্ষণগুলির মধ্যে জ্বর, বমি-বমি ভাব দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া (পেট খারাপ), শ্বাসকষ্ট, হেপাটালজিয়া, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

একাইনোকোক্কোসিস

এটি একটি ফিতাকৃমি জনিত রোগ যা ভেড়ার মধ্যে একিনোকোক্কাস গ্রানিউলোসাস দ্বারা সৃষ্ট হয়। এটি ভেড়ার শরীরের বিভিন্ন অংশে হাইডাটিড গঠনের কারণে হয়ে থাকে।

মনিজিয়াসিস

এটি একটি টেপওয়ার্ম, যা ভেড়ার ক্ষুদ্রান্ত্রে বাস করে এবং যা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই রোগটি মলের হলুদ অংশ দ্বারা নির্ণয় করা যেতে পারে। মেষশাবকেরা টেপওয়ার্ম প্রতিরোধী হয়ে ওঠে।

কোয়েনুরোসিস

এটি ভেড়ার একটি পরজীবী রোগ যা একটি নির্দিষ্ট টেপওয়ার্ম প্রজাতির লার্ভার কারণে হয়ে থাকে (*Taenia multiceps*)। উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে পেশী কম্পন, অন্ধত্ব এবং লালা ঝরা।

স্টিলেসিয়া হেপাটিকা

এটি ভেড়ার পিত্ত নালীতে অবস্থানকারী একটি ফিতাকৃমি, প্রধানত আফ্রিকায় বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় তবে অন্যান্য অঞ্চলেও পাওয়া গিয়ে থাকে। অরিবাটিড মাইট মধ্যবর্তী হোস্ট হিসাবে কাজ করে। গুরুতর বিষন্নতা, ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা, দাঁড়াতে না পারা, জন্ডিস, পেটে ব্যথা, গাঢ় প্রস্রাব, ফ্যাকাশে মল, বমি বমি ভাব-এই রোগের ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি দেখা যায়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ লক্ষণীয়। এই রোগের চিকিৎসার জন্য স্টেরয়েড হলো সর্বোত্তম ঔষধ।

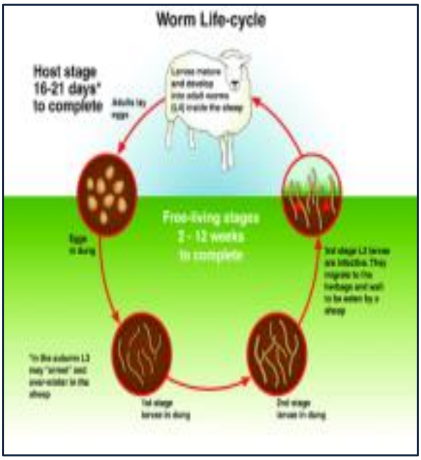

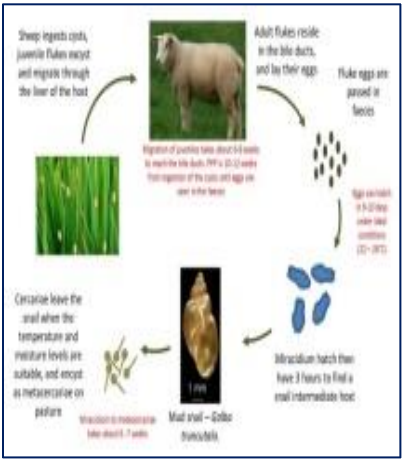

গোলকৃমির
জীবনচক্র

চ্যাপ্টাকৃমির
জীবনচক্র

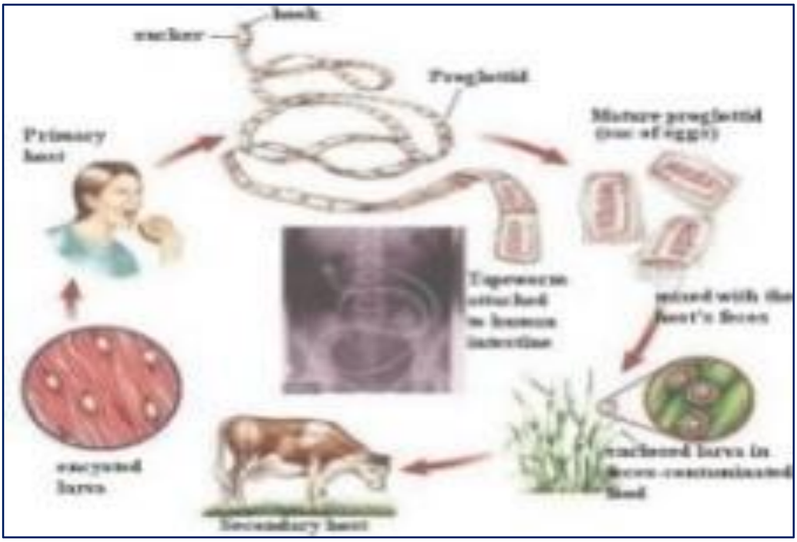

ফিতাকৃমির
জীবনচক্র

প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

ককসিডিওসিস

ককসিডিয়া একপ্রকার আদ্যপ্রাণ, যা মানুষ ও প্রাণীদের অন্ত্রের ভিতর থাকে এবং অন্ত্রের প্রদাহ ও আন্ত্রিক রোগের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন প্রজাতির ককসিডিয়া সংক্রমণের মাধ্যমে গাড়োল ভেড়াছানা ও গাড়োল ভেড়ার আন্ত্রিক ও উদরাময় ঘটিয়ে প্রাণীর স্বাস্থ্য খারাপ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই রোগ সাধারণত পূর্ণবয়স্ক গাড়োল ভেড়ার থেকে গাড়োল ভেড়ার ছোট বাচ্চাদের বেশী হয়, এর জন্য অনেক গাড়োল ভেড়ার বাচ্চা মারাও যায়। অল্প বয়সী ভেড়াদের (মায়ের দুধ খাচ্ছে এমন বাচ্চাদের) এই রোগ বেশী দেখা যায়। রোগটি বর্ষাকালে বেশী হয়। সাধারণত সংক্রামিত জল খাবার, মাটি এবং সংক্রামিত প্রাণীর সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে এই রোগ হতে পারে ঘটে ।

রোগলক্ষণ

দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা, আমাশয়, উদরাময়, অতিরিক্ত জলবিয়োজনের ফলে চামড়া শুস্ক হয়ে যায়, লোমের চকচকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়, রক্তাল্পতা, দূর্বলতা, ওজন কমে যাওয়া, গাড়োল ভেড়ার দুধের পরিমাণ কমে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। বাড়ন্ত ও পূর্ণবয়স্ক ভেড়ার ক্ষেত্রে দেহের তুলনায় পেট বড় হতে থাকে এবং পেট ঝুলে পড়ে, থুতনীর নীচে থলথলে ফোলাভাব দেখা যায়, দেহের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়, দুধ উৎপাদন ও প্রজননক্ষমতা কমে যায় এবং পাতলা পায়খানা হওয়ার ফলে শরীরে জলের অভাবে পরিশেষে মৃত্যু।

দূর্বলতা ও ওজন কমে যায়

আক্রান্ত ভেড়ার মল

মলের মধ্যে ককসিডিয়া জীবাণু

চিকিৎসা ও প্রতিকার

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখায় এই রোগ থেকে বাচার সহজ উপায়। আক্রান্ত বাচ্চার নির্দিষ্ট চিকিৎসার সাথে সঠিক পরিচর্যা দরকার। পরিস্কার ও শুকনো ঘরে ভেড়া পালন করতে হবে। বাচ্চাদের অতিরিক্ত দুধ খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে। রোগ হয়ে গেলে রোগলক্ষন অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার হবে। চিকিৎসার জন্য সালফামেজাথিন (০.২ গ্রাম প্রতি কিলো দেহ ওজনের জন্য), অ্যাম্প্রোসল (২০ পারসেন্ট দ্রবণ ১০০ মিলি গ্রাম প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য) ব্যবহার করা যেতে পারে। এই চিকিৎসা ৪-৫ দিন চলবে।

তাছাড়া নীচের বিষয়গুলি মেনে চলতে হবে

ক) জন্ম থেকেই ভেড়ার সঠিক পুষ্টির ব্যবস্থা করলে পরজীবির আক্রমন অনেক কম হয়।

খ) ভেড়ার বাসস্থান পরিস্কার ও শুকনো রাখা উচিত।

গ) সূর্যোদয়ের দুঘন্টা পরে ভেড়াকে মাঠে চরানো উচিত।

ঘ) একই চারমভূমিতে প্রতিদিন চরানো ঠিক নয়।

ঙ) ধান কাটার অব্যবহিত পরেই ধান জমিতে ভেড়া চরানো উচিত নয় ।

চ) কখনই এঁদো ডোবার জল খাওয়ানো উচিত নয়।

ছ) মল পরীক্ষা করে সহজেই কোন জাতের কৃমি এবং আক্রমনের পরিমান বোঝা যায়। তাই নিয়মিত স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্রে যোগাযোগ রাখা দরকার। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এইসব কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যায়। গাভীন ভেড়াকেও ডাক্তারবাবুর পরামর্শমত কৃমির ঔষধ খাওয়ানো দরকার। টীকাকরণের ১-২ সপ্তাহ আগে কৃমির ঔষধ খাওয়ালে টীকার ফল ভাল হয়।

থাইলেরিয়োসিস

এটি ভেড়ার একটি প্রোটোজোয়ান রোগ (প্যাথোজেন - থাইলেরিয়া পারভা/ থাইলেরিয়া অ্যানুলাটা, ভেক্টর বা এজেন্ট - *Rhipicephalus appendiculatus*)

উপসর্গ- নাক থেকে ফেনাযুক্ত ক্ষরণ বের হয়, চোখ দিয়ে জল ঝরা, অ্যানোরেক্সিয়া, রক্তাল্পতা, উচ্চ জ্বর, লিভার এবং লিম্ফ নোডের বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়। এছাড়াও ফুসফুসে ইডিমা, কিডনিতে সংক্রমণ এবং অধিক মাত্রায় জ্বর পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার (৪৬-১০০)%।

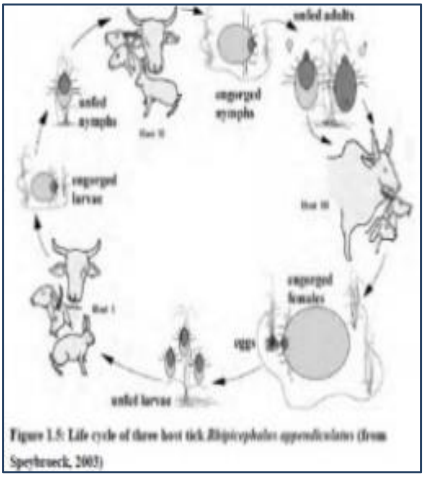

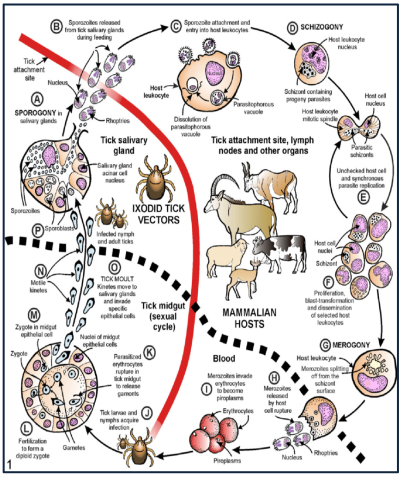

থাইলেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্র

চিকিৎসা ও প্রতিকার

প্রাণীচিকিৎসকের পরামর্শমত দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। বুপারভাকোন হল থাইলেরিয়োসিস চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওষুধ। থাইলেরিয়োসিস চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে অন্যতম ব্যবহৃত ওষুধ হল ইমিডোকার্ব ডিপ্রোপিয়েনেট। এটি ইনজেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং এটি পরজীবী দূর করতে সাহায্য করে।

বেবেসিওসিস

Babesia ovis/B.bigemina, একটি প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ। RBC ভেঙ্গে যাবার কারণে প্রাণী লাল প্রস্রাব করে। আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা না করালে ৪-৫ দিন তারা বেঁচে থাকতে পারে। এটি ফ্লু-এর মতো উপসর্গ সৃষ্টি করে যার ফলে দেখা দেয় গুরুতর অসুস্থতা, শ্বাসকষ্ট এবং ক্ষুধামান্দ্য। এগুলি হল একধরণের আক্রমণকারী এপিসেলুলার পরজীবী যা লোহিত রক্তকণিকার খাঁজযুক্ত পৃষ্ঠে অবস্থান করে।

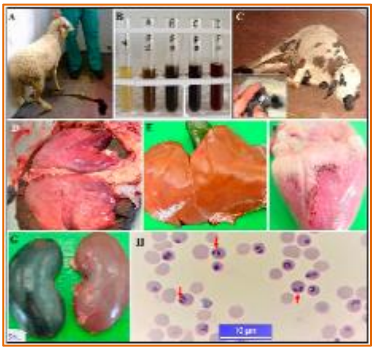

ব্যাবেসিয়া আক্রান্ত প্রাণীর কিছু অঙ্গের ছবি

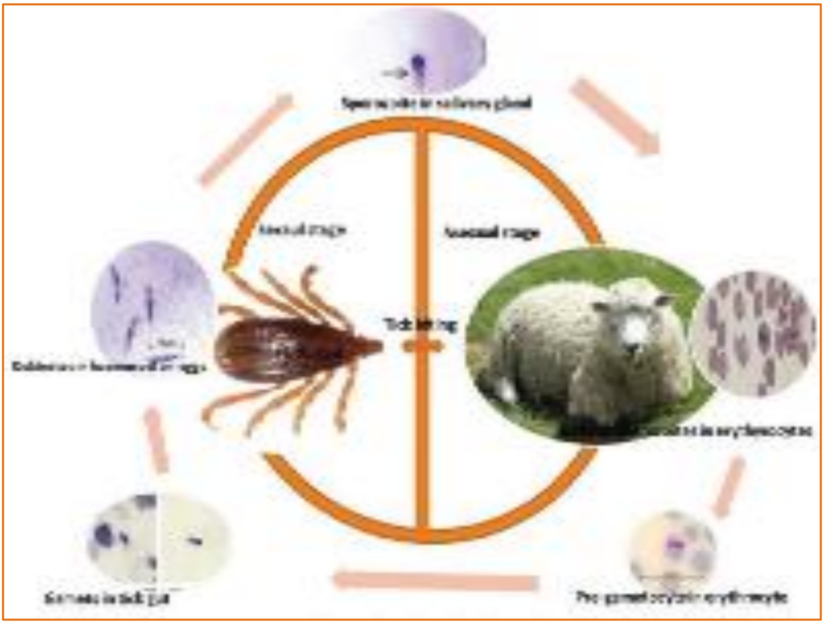

ব্যাবেসিয়া জীবাণুর জীবনচক্র

সাধারণ রোগ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

নাভির প্রদাহ

গাড়োল ভেড়ার বাচ্চা জন্মানোর পর দড়ির মতো যে অংশ পেটের নীচে ঝুলতে থাকে তাকে নাভীর নাড়ী বলে, যার মাধ্যমে মায়ের সাথে ভ্রূণের যোগাযোগ ও পুষ্টি রক্ষা হয়। জন্মাবার পর রক্তাক্ত নাভির নাড়ীতে অনেকসময় সংক্রমণ হয়।

রোগলক্ষণ

নাভিস্থল ফুলে যায় এবং ব্যথা হয়। গাড়োল ভেড়ার বাচ্চা সহজে প্রস্রাব করতে পারে না, চুলকানি হয়, সংক্রমন বেশী হলে পুঁজ হয় এবং পোকা হয়।

ভেড়ার বাচ্চার নাভির প্রদাহ

চিকিৎসা ও প্রতিকার

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখায় এই রোগ থেকে বাচার সহজ উপায়। বাচ্চা জন্মাবার পর নাভির কাটা অংশ মাটিতে ঠেকলে সেখান থেকে সংক্রমণ হতে পারে, তাই কম করে মাটির সংযোজন হলেই ভাল। ঘা হয়ে গেলে প্রথমে দেখতে হবে ভিতরে কোন পোকা তা থাকে, তার্পিন তেল ওই ঘা তে ঢেলে ঘায়ের মুখটা তুলো দিয়ে বন্ধ করে দিলে ধীরে ধী শুককীট) গুলো ঘায়ের বাইরে চলে আসে, তখন চিমটা দিয়ে ওগুলো টেনে বের যদি ৯/১৮ ছি হবে জীবাণুনাশক দিয়ে ওই জায়গাটা মুছে দিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক মলম ব্যাবহার করতে হবে। ওই জায়গায় যাতে বেশী মাছি না বসতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, ওই জায়গায় মাছিনাশক স্প্রে বা মলম ব্যবহার করতে হবে। এই ভাবে ৩-৫ দিন ড্রেসিং করলে ঘা ভালো হয়ে যাবে।

অস্থিসংযোগস্থল প্রদাহ বা গেঁটেবাত (আর্থারাইটিস)

অস্থিসংযোগস্থলে প্রদাহজনিত কারণে ব্যথা অনুভূত হয়। মূলত সামনের ও পিছনের পায়ের হাঁটু, উরু অথবা আঙুলের সংযোগস্থলে এই গেঁটেবাত হয়। জীবাণু (মূলত ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস) অস্থিসংযোগস্থলে বাসা বাঁধার জন্য প্রদাহ হয়। সাধারণত সংক্রামিত পশুর দুধ, শিকনী, লালা বা খাবারের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ায়।

রোগলক্ষণ

অস্থিসন্ধিস্থল ফুলে যায়, ব্যাথার কারনে বেশী নড়াচড়া করতে পারে না, জ্বর, ক্ষুধামন্দা, ওজন কমে যাওয়া যায়।

অস্থিসন্ধিস্থল ফুলে গেছে

অস্থিসন্ধিস্থল ফুলে পা বেঁকে গেছে ভেড়ার বাচ্চার

চিকিৎসা ও প্রতিকার

অস্থিপ্রদাহের গভীরতা অনুযায়ী অস্থিসংযোগস্থলে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন এবং প্রদাহ প্রশমনকারী ওষুধ ইনজেক্ট করে দিতে হবে অস্থিসংযোগস্থলের ভিতর, কিন্তু দেখতে হবে যেন কোনও রকমভাবে অস্থিসংযোগস্থল বেশী কাটাছেঁড়া না হয়। এটা ৩-৫ দিন করতে হবে।

নিউমোনিয়া

গাড়োল ভেড়া পালনে নিউমোনিয়া একটা বড় সমস্যা। নানা কারনে ছাগলে নিউমোনিয়া হতে পারে, যেমন জীবাণু, কৃমি, এমন কিবিষাক্ত গ্যাস গ্রহণ, খাবার বা জল খাওয়ানোর সময় অসাবধানতা বসত ফুসফুসে জল ঢুকলে নিউমোনিয়া হতে পারে। ছাগলে সাধারণত অন্তঃকোষীয় নিউমোনিয়া হয় যা তুলনামূলকভাবে বেশী ক্ষতিকারক।

রোগ লক্ষণ

আক্রান্ত মৃত ভেড়ার ছবি

আক্রান্ত ভেড়া ও সুস্থ ভেড়ার ফুসফুস

প্রথমে দেহের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে (১০৩-১০৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট), ধীরে ধীরে শ্বাস কষ্টও বাড়তে থাকে, মুখ হাঁ করে হাঁপাতে থাকে, সঙ্গে কাশি, সর্দির জন্য নাক বন্ধ বা হলুদ রঙের সর্দি বেরনো, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতাবোধ, ঝিম ধরে শুয়ে থাকা, তারপর হঠাৎ দেহের তাপমাত্রা কমে যাওয়া ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। নিউমোনিয়ার জন্য গাড়োল ভেড়ার মৃত্যুর হার অনেক বেশী।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

যদি ঠিক সময় চিকিৎসা না করা যায়, তবে অনেক সময় মৃত্যু অবধারিত। লক্ষন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা শুরু করা অতি-আবশ্যক। গাড়োল ভেড়ার অবস্থা অনুযায়ী নরফ্লক্সাসিন, সেফটিওফার সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, লেভোফ্লোক্সাসিন, এমোক্সিসিলিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে। জ্বর কমানোর জন্য ফ্লুনিক্সিন মেলুমাইড বা প্যারাসিটামল দিতে হবে। যদি শরীর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে, তখন ডক্সোপরাম হাইড্রোক্লোরাইড ইনজেকশন দিতে হবে।

বৃক্কের পাথর মূত্রাশয়ের পাথর (ইউরিনারি ক্যালিকুলি)

গাড়োল ভেড়া বেশি পরিমাণে দানা খেলে ও কম জল পান করলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পেটটা জলের বলের মতন ঝুলন্ত হয়, কারণ বৃক্ক ও মূত্রথলি প্রস্রাবে ভরে থাকে। খাসি বা পাঁঠাদের এই রোগের হার বেশি কারণ এদের যৌনাঙ্গ 'S' র মতো। তাই সহজে ছোট ছোট পাথর কিডনি থেকে বের হতে পারে না ও জমে যায়। খাদ্যে ফসফরাসের পরিমান বেশি হলে এই পাথর সৃষ্টি হয়।

রোগ লক্ষণ

গাড়োল ভেড়ার ছিঁটে ফোটা প্রস্রাব, কিন্তু বারবার প্রস্বাব করার প্রবণতা, প্রস্রাব করার সময় ব্যথা, অনেক সময় চার পা একসাথে কুঁকড়ে যাওয়ার চেষ্টা, খিঁচুনি, মূত্রদ্বার হলুদাভ হয়ে যাওয়া, বমি- বমি ভাব, দাঁত কাটা, পুরুষাঙ্গের থলি (প্রিপিউস) ফুলে ওঠা।

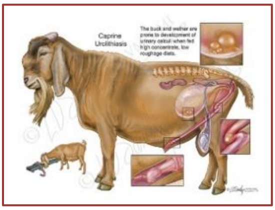

বৃক্ক ও মূত্রথলিতে পাথর জমে

চিকিৎসা ও প্রতিকার

উচ্চ ফসফরাস যুক্ত খাবার বন্ধ করে বেশী করে ঘাস খাওয়াতে হবে। প্রথম দিকের ঘটনা হলে খাবারের সাথে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (০.৫-১.৫ শতাংশ) খাওয়াতে হবে এবং পাথর দ্রবীভূত করার ওষুধ সিস্টোন খাওয়াতে হবে ১০-১৫ দিন, তাতে সুরাহা না হলে শল্য চিকিৎসা দরকার।

ভ্রুণমোচণ বা গর্ভপাত

পূর্ণগর্ভ সমাপ্ত হওয়ার আগে যদি পেটের ভ্রুণ বেরিয়ে যায় তাকেই গর্ভপাত বলে। গাড়োল ভেড়ার অস্বাস্থ্যকর চারণভূমি থেকে নানারকম সংক্রমণ হতে পারে গর্ভকালীন অবস্থায়। জীবাণুর প্রকারভেদে গর্ভধারণের বিভিন্ন সময় গর্ভপাত হয়ে থাকে। গাড়োল ভেড়ার গর্ভপাত ১-২ মাস গর্ভাবস্থায় হতে পারে। সাধারণত যে যে ইনফেনশনের জন্য হয় তা হলো, ক্লামাইডিয়া সিটাকি, টক্সোপ্লাজমা গণ্ডি, ব্রুসেল্লা মেলিটেনসিস, কক্সেলিয়া ব্রুনেটি, লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজেনিস, লেপ্টোস্পিয়া এন্টারোগেন্স, স্যালমনেলা টাইফিমিউরিয়াম, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর এবং ক্ল্যামাইডিয়া ইত্যাদি। ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর গর্ভাবস্থার শেষের দিকে গর্ভপাত বা জন্মের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত গর্ভপাত ঘটাতে পারে। দূষিত খাবার, জল, পশুগৃহের ব্যবহৃত আসবাব, পশুদের মধ্যে মেলামেশা, যৌন রোগ সংক্রমণ, মা থেকে গর্ভস্থ বাচ্চাতে, কিছু জীবাণু ঘটিত রোগ যেমন ব্লুটাঙ্গ ডিজিজ, ক্যাপরিন হারপাস ভাইরাস ইত্যাদি কারণে এই রোগের সংক্রমণ ঘটে।

রোগ লক্ষণ

হঠাৎ পেট থেকে বাচ্চা পড়ে যাওয়া, যোনিপথে রক্ত বা পুঁজ ক্ষরণ, জ্বর, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা- বোধ, উদরাময়, পালান-প্রদাহ প্রভৃতি।

গর্ভপাত হওয়া মৃত ভেড়ার বাচ্চার ছবি

চিকিৎসা ও প্রতিকার

বাচ্চা পড়ে গেলে গাড়োল ভেড়ার জননাঙ্গ জীবাণুনাশক (প্রোভিডন আইওডিন,) এবং অ্যান্টিবায়োটিক (জেনটামাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন) দিয়ে ভালো করে জীবানু মুক্ত করতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন করতে হবে।

গর্ভকালীন বিষক্রিয়া

গর্ভকালীণ সময় যদি মা গাড়োল ভেড়া বেশী মোটা বা হালকা চেহারার হয় এবং যদি জরায়ুতে দুই বা ততোধিক বাচ্চা জন্ম নেয় বা বাচ্চাটি অনেক বড় হয় তাহলে নিজের শরীর ছাড়াও বাচ্চাদের ভরণ পোষণ করতে অনেক গ্লুকোজ বা অন্যান্য পুষ্টি দরকার। যদি সঠিক খাবারের যোগান না পায়, তখন শরীর চেষ্টা করে দেহে জমানো চর্বি থেকে গ্লুকোজের ঘাটতি মেটাতে কিন্তু সাথে সাথে নানারকম কিটোন বডিস (বিষ) তৈরী হয়। এই কিটোন বডিস রক্তে জমা হতে থাকে এবং বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে কিছু বেরিয়ে যায়।

রোগ লক্ষণ

গাড়োল ভেড়া দূর্বল হয়ে পড়ে, মুখ দিয়ে মিষ্টি গন্ধ বের হয়। খাওয়া বন্ধ করে দেয়। শুয়ে থাকে এবং মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে।

গর্ভকালীণ বিষক্রিয়ায় মৃত ভেড়া

চিকিৎসা ও প্রতিকার

লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়াম ও গ্লুকোজ স্যালাইন দিতে হবে ইনজেকশন করে। গর্ভকালীণ সময়ে দানা, ভিটামিন ও প্রোটিন খাবার বেশী করে দরকার।

ভিটামিনের অভাব জনিত রোগ

সাদা পেশীর রোগ

এটি সেলেনিয়াম বা ভিটামিন ই-এর অভাবের কারণে সৃষ্ট একটি অবক্ষয়জনিত পেশী রোগ। এটি কঙ্কালের পেশীকে প্রভাবিত করে। এই রোগটি খাদ্য এবং খনিজ সম্পূরক দিয়ে চিকিত্সা করা যেতে পারে।

আক্রান্ত ভেড়ার পেশী সাদা হয়ে গেছে

পোলিওএন্সেফালোম্যালেসিয়া

এই রোগটি ৫-৮ মাস বয়সী ভেড়ার বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়। লক্ষণগুলির মধ্যে সমন্বয়হীনতা, কম্পন, দুর্বলতা, অন্ধত্ব এবং বিষণ্নতা অন্তর্ভুক্ত। এটি থায়ামিনের ঘাটতি বা খাদ্যযোগ্য জলে সালফারের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে ঘটে।

আক্রান্ত ভেড়া

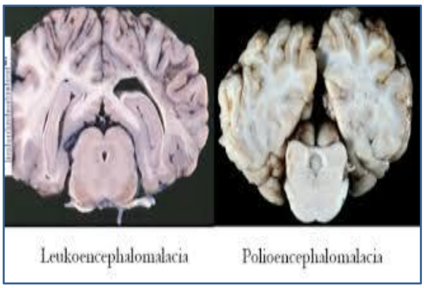

সুস্থ ও আক্রান্ত ভেড়ার মস্তিষ্কের পার্থক্য

ল্যাকটিক অ্যাসিডিওসিস

রুমেনের জীবাণু সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পাকস্থলীকে আরও অ্যাসিডিক করে স্টার্চ ভাঙ্গনের সময় (অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খাওয়ানোর কারণে) উচ্চ স্তরের ল্যাকটিক অ্যাসিড বিপাক করতে পারে না বলে এই রোগটি ঘটে। সঠিক খাবার এবং খাবারে চুনাপাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট রুমেনের অতিরিক্ত অ্যাসিডকে নিরপেক্ষ করবে।

আক্রান্ত ভেড়ার রুমেন

অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য খাবার ফলে হয়

গাড়োল ভেড়ার কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর সুচী

বয়স	ওষুধ	মাত্রা
১-৬ মাস	পাইপারজিন	প্রতি মাসে একদিন (২-৫) এম এল সকালে খালি পেটে খাওয়াতে হবে।
৬ মাসের বেশী	বেন্ডাজল	প্রতি তিন মাস অন্তর একদিন (৩০০-৫০০) মিলিগ্রাম সকালে খালি পেটে খাওয়াতে হবে।

গাড়োল ভেড়ার টীকাকরন সুচী

রোগের নাম	টীকার নাম	মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি	অনাক্রমতা
ছাগ-বসন্ত	গোট পক্স ভ্যাকসিন	০.৩ গ্রাম ভালো করে গুঁড়ো করে ও পিষিয়ে ৩০ মিলি গ্লিসারিন স্যালাইনে গুলে ১০০ টি গাড়োল ভেড়াকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ০.৩ মিলি প্রতিটি গাড়োল ভেড়াকে কানের ডগায় চামড়ার তলায় ইনজেকশন	১ বছর
পি. পি. আর.	পি. পি. আর. ভ্যাকসিন	১ মিলি চামড়ার তলায় ইনজেকশন	১ বছর
ক্ষুরাই	এফ. এম. ডি. ভ্যাকসিন	১ মিলি মাংসপেশিতে ইনজেকশন	৬ মাস
এন্টারোটক্সিমিয়া	মাল্টিক স্পোনেন্ট ভ্যাকসিন	৫ মিলি চামড়ার তলায় ইনজেকশন	৬ মাস

গাড়োল ভেড়ার সংক্রামক নিউমোনিয়া	সি. সি. পি. পি. ভ্যাকসিন	০.২ মিলি কানের ডগায় চামড়ার তলায় ইনজেকশন	৬ মাস
গলাফোলা	এইচ. এস. ভ্যাকসিন	২ মিলি চামড়ার তলায় ইনজেকশন	১ বছর
বজবজে	বি. কিউ. ভ্যাকসিন	২ মিলি চামড়ার তলায় ইনজেকশন	১ বছর
এনথ্রাক্স	এনথ্রাক্স স্পোর ভ্যাকসিন	১ মিলি চামড়ার তলায় ইনজেকশন	১ বছর

বীমাকরন

বর্তমান দিনে যুগের গতির সাথে পা মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা অনেকেই মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছি। কিছু সময় আঘাতটা অনেকটা গভীর হয়ে যায়। প্রাণী পালনের সাথে যুক্ত প্রাণী এবং প্রাণীপালক উভয়কেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাতে সব থেকে বিপদে পড়তে হয় তাদের উপর নির্ভরশীল বাকি পারিবারিক সদস্যদের। ভেড়া পালন করার ক্ষেত্রে হঠাৎ বিপদ থেকে উদ্‌ভূত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য বিমা অত্যন্ত জরুরী। প্রাণী বিমা হল ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে রক্ষা কবচ। ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা আগুন লেগে, বা অজানা রোগে (মড়ক) বা দুর্ঘটনায় ভেড়া মারা গেলে বীমা কোম্পানীর কাছ্ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য বা লোন পেতে হলে প্রাণী বিমা করা জরুরী।

প্রাণীবিমার সুযোগ পেতে হলে ভেড়াপালককে কতকগুলি শর্ত মেনে চলতে হয়। যেমন-

১. দূর্ঘটনা জনিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভেড়ার বীমা। বিভিন্ন সরকারী বা আধা সরকারী ও বেসরকারী কোম্পানী এই কাজ করে থাকে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শংসাপত্র আবশ্যিক, সাধারণভাবে ১ বছরের বীমা করা হয়। অনেকক্ষেত্রে ৩ বছরের ও হয়ে থাকে।

২. একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রতি বছর বীমা কোম্পানির নিকট জমা করতে হবে। বীমার টাকা নির্ভর করে ভেড়ার দামের উপর যা সাধারণত ৩০০০-১০০০০। এর হার ৫% + GST । উদাহরণস্বরূপ, ভেড়ার দাম ৫০০০ টাকা হলে বাৎসরীক প্রিমিয়াম হবে ২৫০ টাকা + ৪৫ টাকা = ২৯৫ টাকা।

৩. মারা গেলে কোম্পানীকে খবর দিতে হয়। ডাক্তারবাবুকে জানাতে হবে। কানে দুল পরা অবস্থায় ছবি, ডেথ সার্টিফিকেট, পোষ্টমর্টেম সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট কাগজ ও ব্যাঙ্কের পাশবই-র তথ্য জমা করতে হবে।

আবশ্যিক বিষয়-

১. ভেড়াটির যত্ন ও সুরক্ষা দিতে হবে।

২. প্রাণী চিকিৎসার পরামর্শমত নিয়মিত ভেড়াকে রোগ প্রতিষেধক টীকা সঠিক পরিচর্যা ও কৃমিনাষক ঔষুধ খাওয়ানোর নথি রাখতে হবে।

৩. কানে দুল না থাকলে ক্ষতিপূরণ পাবেন না।

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ - বন্যা/খরা/ভূমিকম্পে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ হয় না।

বীমাকরনের জন্য নিকটবর্তী প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্র, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, অথবা ব্লকস্তরে বি এল ডিও বা জেলা উপঅধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ অফিসে যোগাযোগ করলে বিশদে জানা যায়।

সরকার পরিচালিত চারটি বিমা কোম্পানীর নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা হল:

১) ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, মিডিলটন স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭১

২) ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ৩৮ বি, জহরলাল নেহেরু রোড, চৌরাস্তা, কোলকাতা ৭০০ ০০১

৩) নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ৪, ম্যাঙ্গো লেন, কোলকাতা – ৭০০০০১

৪) ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, ৪, লায়ন্স বেঞ্জ, কোলকাতা – ৭০০০০১

এছাড়া বেশ কিছু প্রাইভেট বিমা কোম্পানীর মাধ্যমেও প্রাণীবিমা করা যায়। অনেক সরকারী প্রকল্প রূপায়নের সময় ব্যাঙ্ক নিজ উদ্যোগেই প্রাণীবিমার ব্যবস্থা করে দেয়।

উদ্যোগী উপভোক্তাদের ভেড়া পালনের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার লক্ষে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। উপভোক্তারা নিজেদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও বিনিয়োগের পরিমান অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ গ্রহন করতে পারেন। এখানে কয়েকটি বিশেষ প্রকল্পের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। বিস্তারিত বিবরনের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, বিএলডিও, বিডিও এবং জেলাস্তরে ডিআরডিসি, উপ অধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বিপনন ও বাজারীকরন

সঠিকভাবে বিপনন ও বাজারীকরনের স্বার্থে ভেড়াপালন কারীদের দলবদ্ধ প্রয়াশ একান্ত প্রয়োজন। দল বা গোষ্ঠীবদ্ধ হলে ভেড়া পালনকারীরা বেশী আয় করতে পারেন। যৌথ প্রয়াশের ফলে যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে (বাচ্চা ক্রয়, দানাখাদ্য ক্রয়, বীমাকরন, চিকিৎসা ও টীকাকরন শিবির প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) ব্যবসা করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দ্রব্যও সুলভ হয়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে ফড়েদের এড়িয়ে ভেড়া বেশীদামে বাজারজাত করা যায়।

সেল্ফ হেল্প গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে বা নাবার্ডের (Nabard) অর্থ সাহায্যে গাড়ল ভেড়া উৎপাদন সংস্থা (Producers Organisation) গড়ে বিপনন করা যেতে পারে। আবার পঃ বঃ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীন রাজ্য গ্রামীন আজীবিকা মিশন আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেড়া পালনকারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বৃহৎ আকারে তাদের ভেড়াগুলি সঠিকমুল্যে বাজারজাত করতে পারেন।

পঃ বঃ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের অধীনস্থ পঃ বঃ প্রাণী উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন) পূর্বনির্ধারিত সমযোতা চুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামে ভেড়া পালনকারীদের থেকে কিছু পরিমান ভেড়া ক্রয় এবং বিজ্ঞান সম্মত প্যাকেটজাত করে ভেড়ার মাংস বাজারজাত করছে। উৎসাহী ভেড়াপালকগণ ঐ সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে ও যুক্ত হতে পারেন।

প্রশিক্ষণ

সঠিক উপায়ে এবং লাভজনক ভাবে ভেড়া প্রতিপালন করতে হলে চাষী / খামারী / উপভোক্তাদের অবশ্যই প্রশিক্ষন নিয়ে কাজ শুরু করা উচিত। প্রশিক্ষিত উপভোক্তা নিজেই প্রতিদিনের সমস্যা সামলে নিতে পারেন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরী করতে সক্ষম হন। তাছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সাহায্য পাবার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার লাভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ বছরের বিভিন্ন সময়ে ছাগল ও ভেড়া প্রতিপালনের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে থাকে। সাধারণত ৫-১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কল্যাণী বুদ্ধ পার্কে ছাগল প্রজনন খামারে, নদীয়ার হরিণঘাটা ফার্মে, পশ্চিম মেদিনীপুরের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ছাগল প্রতিপালন খামারে এই প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। তাছাড়া রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই উপ অধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও পরিষদ আধিকারীকের দপ্তরের মাধ্যমে ছাগল ও ভেড়া প্রতিাপালনের উপর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র (KVK), সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ (CADC), রাষ্ট্রীয় দোহ গবেষণা সংস্থা (NDRI) কল্যাণী, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BCKV), মোহনপুর, নদীয়া, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের (WBUAFS) সম্প্রসারন শাখা বছরের বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা যেমন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, লোকশিক্ষা পরিষদ নরেন্দ্রপুর, সমাজশিক্ষন প্রশিক্ষন কেন্দ্র বেলুড়মঠ (৬ মাস) ইত্যাদি কেন্দ্রে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য উপভোক্তাকে নিজের নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট ব্লকের বি.এল.ডি.ও অথবা জেলার উপ-অধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগে আবেদন করতে হবে। প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

তাছাড়া প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ইচ্ছুক উপভোক্তা সরাসরি নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আবেদন করতে পারেন|

প্রাণীপালনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ঠিকানা:

1. অধিকর্তা, গবেষণা সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ, পঃ বঃ প্রাণী মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

2. অধিকর্তা, সম্প্রসারণ বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নাদীয়া

3. অধিকর্তা, সম্প্রসারণ বিভাগ, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পুন্ডিবাড়ী, কোচবিহার

4. অধিকর্তা, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন,দঃ চব্বিশ পরগণা

5. অধ্যক্ষ, পল্লী শিক্ষা ভবন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

6. অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির, বেলুর মঠ, হাওড়া

7. অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/স্টেট এগ্রিকালচার এন্ড এক্সটেনশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, নরেন্দ্রপুর,দঃ ২৪ পরগণা

8. অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি, মুর্শিদাবাদ

9. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ (অতিরিক্ত) সারগাছি, (RKMVERI)

10. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, মাইলবাসা, মুর্শিদাবাদ (WBUAFS)

11. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর (UBKV)

12. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান,কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, জগতবল্লভপুর, হাওড়া (BCKV)

13. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, চুঁচুড়া, হুগলি (BCKV)

14. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা (WBUAFS)

15. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, বুদবুদ, বর্ধমান (CRIJAF)

16. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার (UBKV)

17. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, রতুয়া, মালদা (UBKV)

18. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, মাঝিহান, দক্ষিণ দিনাজপুর (UBKV)

19. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, গয়েশপুর, নদীয়া (BCKV)

20. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, রথীন্দ্র কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, শ্রীনিকেতন, বীরভূম (PSB- Visva Bharati)

21. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, কালিম্পং, দার্জিলিং (UBKV)

22. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, কল্যাণ, পুরুলিয়া (Kalyan NGO)

23. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, রামশা, জলপাইগুড়ি (UBKV)

24. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, সোনামুখী, বাঁকুড়া (WBCADC)

25. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নিমপীঠ আশ্রম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (SRAN)

26. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, ঝাড়গ্রাম (BCKV)

27. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (অতিরিক্ত) অরপাঁচ, (RKMVERI)

28. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, মালদা (অতিরিক্ত) (ICAR-CISH)

29. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, উত্তর ২৪ পরগনা (অতিরিক্ত) (ICAR-CRIJAF)

30. বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নদীয়া (অতিরিক্ত), কল্যাণী, (ICAR-NDRI, ERS)

31. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, বলরামপুর প্রকল্প, বলিয়ারহাট, কোচবিহার

32. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, ফালাকাটা প্রকল্প, জটেশ্বর, আলিপুরদুয়ার

33. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, কালিম্পং প্রকল্প, কালিম্পং, কালিম্পং

34. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, শিলিগুড়ি নকশালবাড়ি প্রকল্প, মাটিগাড়া, দার্জিলিং

35. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, গোয়ালপোখর-২ প্রকল্প, চাকুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর

36. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, কালিয়াগঞ্জ প্রকল্প, বাঘোন, উত্তর দিনাজপুর

37. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, রতুয়া-২ প্রকল্প, সম্বলপুর, মালদা

38. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, নলহাটি প্রকল্প, নলহাটি, বীরভূম

39. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, বহরমপুর প্রকল্প, ভাকুড়ি, মুর্শিদাবাদ

40. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, রানাঘাট প্রজেক্ট, আড়ঙ্গহতা, নদিয়া

41. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, হরিণঘাটা প্রকল্প, বড়জাগুলি, নদীয়া,

42. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, গাইঘাটা প্রকল্প, ভিল-বাগনা, উত্তর ২৪ পরগনা

43. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, দেগঙ্গা প্রকল্প, দেবালয়, উত্তর ২৪ পরগনা

44. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, তমলুক প্রকল্প, রণসিঙ্গা,পূর্ব-মেদিনীপুর

45. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, ডেবরা প্রকল্প, ডেবরা বাজার, পশিম মেদিনাপুর

46. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, সোনামুখী প্রকল্প, রাধামোহনপুর, বাঁকুড়া

47. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, সহরজোর প্রকল্প, বেগুনকোদর, পুরুলিয়া

48. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, কালনা-২ প্রকল্প, বৈদ্যপুর, পূর্ব-বর্ধমান

49. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, বৈঞ্চি প্রকল্প, বৈঞ্চি, হুগলি

50. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, বাগনান প্রকল্প, বাগনান, হাওড়া

51. কর্মকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ, অযোধ্যা পাহাড় প্রকল্প, অযোধ্যা, পুরুলিয়া

52. উপ-অধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, নির্দিষ্ট-জেলা

53. সমষ্টি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক, নির্দিষ্ট-ব্লক

54. ডিসট্রিক্ট ডেভলপমেন্ট ম্যানেজার, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, নির্দিষ্ট-জেলা

55. পরিচালন- অধিকর্তা, পঃ বঃ প্রাণী উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন)

56. পঃ বঃ রাজ্য গ্রামীন আজীবিকা মিশন - ০৩৩-২৩৩৫৩৭৩১/৩৭২১

57. সমবায় দপ্তর, পঃ বঃ সরকার - ০৩৩-২২৪৮-৬২৭১

58. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তর, পঃ বঃ সরকার - ০৩৩-২২৬২-৫৮৫৯

59. পঃ বঃ SC, ST & OBC Development & Finance Corporation - ০৩৩-৪০২৬-১৫০০/১৫০৫/১৫

60. সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর, পঃবঃ সরকার - ০৩৩-২৩৩৪-৯৭৭০/ ২৩৫৯-৮৪৭২

প্রাণীপালন সম্পর্কিত সরকারী খামার ও ঠিকানা

ভেড়া পালন কেন্দ্র

1. শিপ ব্রিডিং ফার্ম, কল্যাণী, নদীয়া
2. শিপ এক্সটেনশন সেন্টার, রণজিতপুর, বাঁকুড়া
3. শিপ ফার্ম, লোকপুর, বাঁকুড়া

ছাগল পালন কেন্দ্র

1. গোট ফার্ম, হরিণঘাটা, নদীয়া
2. গোট ফার্ম, SBF কল্যাণী, নদীয়া
3. গোট ফার্ম, SLF কল্যাণী, নদীয়া
4. গোট ফার্ম, বড়মুল্লাহ, সিউড়ি, বীরভূম
5. গোট ফার্ম, কোতলপুর, বাঁকুড়া

গবাদিপ্রাণী পালন কেন্দ্র

1. হরিণঘাটা ফার্ম (ক্যাটল-সেকশন), নদীয়া
2. AICRPC- হরিণঘাটা ফার্ম, নদীয়া
3. স্টেট লাইভস্টক ফার্ম, কল্যাণী, নদীয়া
4. D.C.F-সাঁওতালডিহি, পুরুলিয়া
5. D.F. St. Mary's দার্জিলিং

প্রাণীখাদ্য প্রক্রিয়াকরন কেন্দ্র

1. হরিণঘাটা ফার্ম, (মেইন ও নর্থ), নদীয়া
2. ফুলিয়া ফডার ফার্ম, নদীয়া
3. কল্যাণী ফার্ম, নদীয়া
4. বেলডাঙ্গা ফডার ফার্ম, মুর্শিদাবাদ
5. বালিগরি ফডার ফার্ম, হুগলি
6. কাটোয়া ফডার ফার্ম, বর্ধমান
7. রসুলপুর ফডার ফার্ম, বর্ধমান
8. রণজিতপুর ফার্ম, বাঁকুড়া
9. কোতলপুর ফডার ফার্ম, বাঁকুড়া

10. লোকপুর ফার্ম, বাঁকুড়া
11. শালবনী ফডার ফার্ম-১, পশ্চিম মেদিনীপুর
12. শালবনী ফডার ফার্ম-২, পশ্চিম মেদিনীপুর
13. ঝটিয়াখালি ফার্ম, জলপাইগুড়ি
14. দুংরা ফডার ফার্ম, দার্জিলিং
15. পেদং ফডার ফার্ম, দার্জিলিং

পোলট্রি ফার্ম

ক্রম	ফার্মের নাম	ঠিকানা
১	টালিগঞ্জ, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, টালিগঞ্জ, ৪২-গ্রাহাম রোড, কলকাতা
২	কাকদ্বীপ, এস পি এফ	পোস্ট, গ্রাম- অক্ষয়নগর, ব্লক কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা
৩	নিমপীঠ, এস পি ডি এফ	স্টেট পোল্ট্রি এন্ড ডাক ফার্ম, নিমপীঠ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
৪	গোবরডাঙ্গা, এস পি এফ	এস পি এফ, গোবরডাঙ্গা, হাই দাদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা
৫	হরিণঘাটা, এস পি এফ	এস পি এফ, হরিণঘাটা ফার্ম, পোস্ট মোহনপুর, জেলা নদীয়া
৬	হরিণঘাটা, আর কে ভি ওয়াই	এস পি এফ জর্জ, আর কে ভি ওয়াই, হরিণঘাটা, মোহনপুর, নদীয়া

৭	রানাঘাট, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, রানাঘাট নদীয়া
৮	কৃষ্ণনগর, এস পি এফ	এসপিএফ, এনএইচ-৩৪, কৃষ্ণনগর
৯	বহরমপুর, এস পি এফ	এস পি এফ, বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ
১০	ডোমকল, এস পি এফ	ডিসিএফ, ডোমকল, গ্রাম ও পোস্ট ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ
১১	কাঁটাপুকুর, ডি সি এফ	ডিসিএফ, গ্রাম এবং পোস্ট-কাঁটাপুকুর, পুলিশ স্টেশন বাগনান, হাওড়া
১২	বালিগড়ি, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, বালিগড়ি, হুগলি
১৩	মেদিনীপুর, এস ডি পি এফ	স্টেট ডাক এন্ড পোল্ট্রি ফার্ম, পশ্চিম মেদিনীপুর
১৪	কন্টাই, এস পি এফ	গ্রাম- কিশোরনগর, কন্টাই, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর
১৫	দুর্গাপুর, এস পি এফ	এস পি এফ, দুর্গাপুর, কোকেভন কলোনী, দুর্গাপুর-২
১৬	গোলাপবাগ, এস পি এফ	এস পি এফ, গোলাপবাগ, পূর্ব বর্ধমান

১৭	বাঁকুড়া, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, বাঁকুড়া
১৮	সিউড়ি, এস পি এফ	ডিস্ট্রিক্ট কম্পোজিট ফার্ম, বড়ামাহুল্লা, সিউড়ি, বীরভূম
১৯	সিউড়ি, আর কে ভি ওয়াই	সিউড়ি, আর কে ভি ওয়াই
২০	বালুরঘাট, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, বেলতলা পার্ক, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর
২১	রায়গঞ্জ, এস ডি বি এফ	গ্রাম- উদয়পুর, পোস্ট কর্ণঝোড়া, জেলা উত্তর দিনাজপুর
২২	কালিম্পং, পি এম সি	পি এম সি. দুত্তরা, সিড ফার্ম, কালিম্পং
২৩	কার্শিয়াং, পি এম সি	পি এম সি, গিদ্যাপাহাড়, কার্শিয়াং
২৪	মোহিতনগর, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, মোহিতনগর, জলপাইগুড়ি
২৫	কোচবিহার, এস পি এফ	এস পি এফ, কোচবিহার, নীলকুঠির নিকট, রেলগুমটি, কোচবিহার

স্বাস্থ্যসম্মত মাংস প্রক্রিয়াকরণ

মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদার বৃদ্ধি মেটাতে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জীবিকার চাহিদা মেটাতে, বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে এবং নারী উন্নয়নে প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণীপালন অন্যতম প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রথাগতভাবে প্রানীপালনের পাশাপাশি মাংস ও মাংসজাত দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার প্রবনতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষের ক্রমবর্ধমান ব্যস্ততা, বাড়ীর মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হবার বৃদ্ধির হার, খাদ্যাভাষে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদির কারনে প্রচলিত, যত্রতত্র অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাংস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিপনন পদ্ধতিতে পরিবর্তন একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অস্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রক্রিয়াকৃত মাংস ভক্ষণ অনেকসময়ই সমূহ বিপদ ডেকে আনে। সজীব, রোগহীন প্রানীর/পাখীর মাংস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে মানুষের রন্ধন উপযোগী এবং সংরক্ষন করাই হল মাংস প্রক্রিয়াকরণ।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাংস প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয়তা

১. বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাংস প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

২. সঠিক মূল্যে অনেক বেশী সংখ্যক মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়াকৃত মাংস সরবরাহ করা।

৩. হিমায়িত করনের ফলে শহরে সরবরাহ করার সুযোগ বৃদ্ধি এবং লোকসানের ঝুঁকি কম করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত মাংস বিক্রয়ের পথ সুগম করা।

৪. একই প্রাণী বা পাখী থেকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত প্রক্রিয়াকৃত মাংস, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত প্রক্রিয়াকৃত মাংস অপেক্ষা বেশী, ফলত চাষির লাভের পরিমান ও বেশী হয়।

৫. বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত প্রক্রিয়াকৃত মাংস অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ও সুস্বাদু হয়।

৬. শরীরের আলাদা আলাদা অংশ বিভিন্ন মুল্যে উপভোক্তার পছন্দমতো সরবরাহ করা।

মাংস প্রক্রিয়াকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ

১. ভেড়া পরীক্ষা (Antemortem Inspection)

হাট, খামার বা চাষির বাড়ি থেকে আনা ভেড়াগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে রোগগ্রস্থ ভেড়াগুলিকে বাতিল করে, প্রক্রিয়াকরনের জন্য নির্বাচিত ভেড়াগুলিকে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা বিশ্রাম, ১০ ঘন্টা আগে থেকে খাবার এবং ৪ ঘন্টা আগে থেকে জল খাওয়ানো বন্ধ করে দিতে হবে। এতে একদিকে খরচ যেমন কম হবে অন্যদিকে মাংসের গুনগত মান ও বৃদ্ধি পাবে।

২. অচেতন করন (Stunning)

জবাই এর সময় ভেড়াগুলির ওপর অপ্রয়োজনীয় ব্যথা এবং নিষ্ঠুরতা এড়ানোর জন্য ভেড়াগুলিকে খুব অল্প সময়ের (৩০ সেকেন্ড থেকে ১ মিনিট) জন্য অচেতন করা হয়। অচেতন হবার ফলে যেমন প্রক্রিয়াকরণে সুবিধা হয় তেমনি মাংসের গুনগত মান ও উন্নত হয়। বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে তডিতাহিতকরন (Electrical Stunning) পদ্ধতিটি বেশী জনপ্রিয় ও প্রচলিত। একটি যন্ত্রের (Elther Apparatus) সাহায্যে সাধারণত ৭৫ ভোল্টের তুলনামূলকভাবে কম ভোল্টেজের একটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কারেন্ট (250mA) ১০ সেকেন্ডের জন্য মাথার ভিতর পাঠানো হয়। ভেড়ার দুপাশে কানের গোড়ায় ইলেক্ট্রোড দুটি চেপে ধরা হয়। চুল এবং ত্বকের মাধ্যমে সহজেই তড়িৎ প্রবাহিত করার জন্য ২০% লবণাক্ত দ্রবণে ইলেক্ট্রোড দুটি ভিজিয়ে রাখা হয়। সাধারনত ছোট প্রাণীর (ছাগল, ভেড়া, শুকর) জন্য এই পদ্ধতি ব্যাবহৃত হয়, প্রধানত শিল্পক্ষেত্রে (যেখানে প্রতিদিন অনেক মাংস উতপাদন হয়)।

৩. রক্ত নিঃসরণ (Bleeding)

অচেতন করণের সঙ্গে সঙ্গেই ভেড়া কে উল্টো করে ঝুলিয়ে, গলার রক্তবাহী নালীটি (জুগুলার ভেন) হালাল পদ্ধতিতে অর্থাৎ গলাকে সম্পূর্ণভাবে শরীর থেকে আলাদা না করে কাটতে হবে যাতে শরীরের রক্ত নিঃসরণ ভালোভাবে হয়। যেহেতু রক্ত ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধিতে সহযোগী তাই যত বেশী রক্ত নিঃসৃত হবে মাংসের গুনগত মানও বৃদ্ধি পাবে এবং সংরক্ষনেও সুবিধা হবে। নালী কাটা অবস্থায় ভেড়াকে ঝুলন্ত অবস্থায় ৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। ভেড়ার শরীরে তার গোটা ওজনের ৬.৫-৮ শতাংশ ভাগ রক্ত থাকে।

৪. চামড়া বিচ্ছিন্নকরণ (De-Skinning)

ভেড়ার ক্ষেত্রে পুরো রক্ত নিঃসরণের পর মাথাটাকে কেটে বাদ দেবার পর লোম সহ চামড়া তুলে ফেলতে হবে। যে হাতে করে চামড়া ছাড়ানো হবে সেই হাত কে চামড়ার ভিতরের দিকে যতটা কম সম্ভব ব্যাবহার করতে হবে, না হলে লোম ভিতরের মাংসের দিকে গেঁথে যায়।

৫. ধৌতকরণ (Washing) এবং শরীর উন্মুক্তকরন (Evisceration)

ভেড়ার চামড়া বিচ্ছিন্নকরণের পর বুক ও পেটের সংযোগ স্থলে ছুরি দিয়ে কেটে উন্মুক্তকরনের পরে খাদ্য অনুপযোগী অংশগুলিকে বের করে ফেলতে হবে। শরীরের ভিতরের অংশগুলির মধ্যে শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ড, লিভার (মেটে), ফুস্‌ফুস খাদ্য হিসাবে ব্যাবহৃত হয়। এরপর পাইপ এর জলের জোরে ঝাপটা দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে, এতে জলের খরচ যেমন কম হবে তেমনি পরিষ্কার ও ভালো হবে। মাংসের মধ্যে জল যত কম থাকবে মাংস সংরক্ষণ ও তত বেশী দীর্ঘস্থায়ী হবে।

৬. অংশকরন (Cut-Up)

ভেড়ার পুরো দেহকে ৬-৭ টা টুকরো (প্রতিটা টুকরো ১-১.৫ কেজি) করে সংরক্ষণ এর জন্য পাঠাতে হবে, অথবা উপভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী বিক্রি করা যেতে পারে।

৭. সংরক্ষন (Storage)

প্রক্রিয়াকৃত মাংসকে শীতলীকরনের মাধ্যমে অর্থাৎ ১২ ঘন্টা ৩২ ডিগ্রি ফাঃ থেকে ৪৫ ডিগ্রি ফাঃ তাপমাত্রায়, তারপর ২৪ ঘন্টা ৩৪ ডিগ্রি ফাঃ তাপমাত্রায় ফ্রিজে রাখতে হবে। এইভাবে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত মাংস ভালোভাবে খাদ্য উপযোগী করে রাখা যায়। এরপর মাংসকে প্রয়োজন মত টুকরো (রন্ধন উপযোগী) করে অতি শীতলীকরণের মাধ্যমে অর্থাৎ ১০ ডিগ্রি ফাঃ তাপমাত্রায় ৩ মাস পর্যন্ত ভালোভাবে খাদ্য উপযোগী করে রাখা যায়। দূরবর্তী স্থানে পাঠানোর জন্য মাংসকে নির্দিষ্ট ওজন অনুযায়ী বায়ুহীন প্যাকেটে (Vaccum Pack) ভরে, প্যাকেটগুলিকে অন্তরক (Insulated) বাক্সে (১৪ ডিগ্রি ফাঃ তাপমাত্রায়) ভরে পাঠাতে হবে।

মাংস বিক্রেতার করণীয় কর্তব্য

১. সংক্রামক রোগযুক্ত ভেড়াকে মাংস হিসাবে না কাটা/বিক্রি না করা।

২. নিজের কোন সংক্রমন নিয়ে মাংস না কাটা বা বিক্রি করা।

৩. অবশ্যই মাংস কাটার সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অ্যাপ্রন, টুপি এবং গ্লাভস পরতে হবে।

৪. মাংস কাটার প্রতিটা ধাপ সঠিক সময়ে শেষ করতে হবে, অযথা দেরি করলে মাংসের গুনগত মান খারাপ হয় এবং মাংস সংরক্ষণেও সমস্যা হয়। দেখা গেছে ৩০ মিনিট খোলা পরে থাকার জন্য মাংসে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

৫. মাংস কাটার জিনিষপত্র স্টেনলেস স্টীলের হতে হবে। মাংস কাটার পরে অবশ্যই ক্ষার দ্রবন (ডিটারজেন্ট) দিয়ে ধুয়ে রাখতে হবে এবং পরের দিন ব্যাবহারের আগে গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে।

৬. প্রবাহমান জলে মাংস ধুতে হবে। পরিষ্কারের জন্য বালতির জলে ডুবিয়ে তোলা উচিৎ না, এতে সংক্রমনের সম্ভবনা বৃদ্ধি পায়।

৭. কসাইখানায় সবথেকে বেশী যেটা দরকার হয় তা হল প্রবাহমান জল, কাজের শেষে যন্ত্রপাতি, ভেড়া রাখার ঘর/খাচা লঘু পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা দরকার।

৮. মাংস ঘরের আবর্জনা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নির্ধারিত জায়গায় ফেলতে হবে।

প্রাণীর বয়স, লিঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস, শরীরের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতির ওপর মাংসের পুষ্টিগুণ নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর মাংসের পুষ্টিগুণের (মুলত ফ্যাট এবং প্রোটিন) একটা মোটামুটি ধারণা নিচে দেওয়া হল

বিভিন্ন প্রজাতির মাংস	**ফ্যাট (%)**	**প্রোটিন (%)**
মুরগী	৪-১০	১৮-২৪
হাঁস	১০-২২	১৬-২৩
টার্কি	৫-৮	২৪-২৮
কোয়েল	৮-১৩	১৯-২২
খরগোস	৪-৭.৫	১৯-২৩
ছাগল	১১-১৮	১৮-২২
ভেড়া	১২-১৫	১৭-২২
শুকর	১০-২৮	১৮-২৪
গরু	৭-১৫	১৬-২৫

বিভিন্ন সরকারী সহয়তা মূলক প্রকল্প

১. ন্যাশানাল লাইভস্টক মিশন (NLM)

উদ্দেশ্যঃ- প্রাণীসম্পদ ভিত্তিক উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধি

কে বা কারা এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারে- প্রশিক্ষিত উদ্যোগী / বিশেষজ্ঞ / যথোপযুক্ত প্রশিক্ষিত ও প্রযুক্তির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনির্ভর দল / FPO / JLG ইত্যাদি।

অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী যোগাযোগ- "হাব ও স্পোক মডেল"

কোন কোন ক্ষেত্রের খরচগুলি এই প্রকল্প বহন করে না- কার্যকরী মূলধন, জমি কেনা বা লিজ নেওয়া খরচ, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস, ব্যক্তিগত গাড়ীর খরচ এই সকল ক্ষেত্রে কোন অনুদান পাওয়া যায় না।

জমির প্রকৃতি কেমন হবে- নিজস্ব জমি অথবা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিভিত্তিক জমি প্রয়োজন।

আবেদন পদ্ধতি- পোর্টালের মাধ্যমে nlm. udyamimitra.in অথবা সরাসরি আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

অনুদানের প্রকৃতি- মূলধনী অনুদান

আর্থিক সহায়তার পদ্ধতি- ব্যাঙ্ক ঋণ নির্ভর প্রকল্প অথবা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টিযুক্ত নিজস্ব তহবিল থেকেও হতে পারে।

অনুমোদিত প্রকল্প

মুক্তাঙ্গন পদ্ধতিতে মুরগী পালন প্রকল্প-

প্রকল্পের আয়তন- নূন্যতম ১০০০ সংখ্যার ডিম পাড়া মুরগী। পেরেন্ট ফার্ম, হ্যাচারী, মাদার ইউনিট ইত্যাদি সহ।

অনুদান সহায়তা- অর্ধেক বা সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা।

ছাগল ভেড়া পালন (উচ্চ বংশগত ছাগল বা ভেড়া নিয়ে প্রজনন খামার গড়ে তুলতে হবে)

প্রকল্পের আয়তন- সর্বনিম্ন ১০০+৫, সর্বোচ্চ ৫০০+২৫ প্রাণী।

অনুদান সহায়তা- অর্ধেক অথবা সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা।

শূকর পালন (মাংস উৎপাদন ও বিপনন)

প্রকল্পের আয়তন- সর্বনিম্ন ৫০+৫, সর্ব্বোচ্চ ১০০+১০।

অনুদান সহায়তা- প্রকল্প মূল্যের অর্ধেক অথবা সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা।

সবুজ গো-খাদ্যের বীজ উৎপাদন (ব্রিডার/ফাউন্ডেশন/সার্টিফায়েড বীজ উৎপাদন)

প্রকল্পের আয়তন- বীজের প্রকৃতি অনুযায়ী।

অনুদান সহায়তা- ১০০ শতাংশ।

ব্রীডার বীজ - ২৫০ টাকা / কে.জি., ফাউন্ডেশন বীজ - ১৫০ টাকা / কে.জি., সার্টিফায়েড বীজ - ১০০ টাকা / কে.জি.

গো-খাদ্যের মূল্য সংযোজন (সাইলেজ / ফডার ব্লক তৈরী, TMR, সংরক্ষণ)

প্রকল্পের আয়তন- ২০০০ - ২৪০০ মেট্রিক টন প্রতি বছর।

আর্থিক সহায়তা- প্রকল্প মূল্যের অর্ধেক অথবা সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট টাকা AHIDF থেকে পাওয়া যেতে পারে (পরিকাঠামো উন্নয়ণ ও যন্ত্রপাতির খরচ বাবদ)

NLM -এ বিশেষ সংযোজন

এ্যানিমেল ওয়েস্ট থেকে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট

প্রাণীর টাকা বা ঔষধ তৈরীর নতুন কারখানা

টীকা বা ঔষধ তৈরীর কারখানার উন্নয়ন বা শক্তিশালী করা

বর্তমান রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র-র উন্নয়ণ

নতুন রোগ নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপন

টীকা বা ঔষধ সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ণ সংক্রান্ত কার্য্যাক্রম

২. কিষান ক্রেডিট কার্ড (প্রানীপালন)

অতি-সম্প্রতি ভারত সরকার কৃষিকার্যের সাথে সাথে প্রাণীপালনকেও কিষাণ ক্রেটিড কার্ডের আওতাভুক্ত করিয়াছে। ডেয়ারী পোল্টীর এভং ছাগল ও ভেড়া চাষের সঙ্গে যুক্ত উপভোক্তাগন বর্তমানে কিষান ক্রেটিড কার্ডের মাধ্যমে ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কার্যকরী মূলধন (Working Capital) অতি অল্প সুদে (মাত্র ৪%) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক / কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সাহায্য রূপে পেতে পারেন। কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত উপভোক্তাগণ যাদের কাছে ইতিমধ্যেই এই কার্ড আছে তাঁরা প্রাণীপালনকে যুক্ত করলে ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। প্রাণী পালনের সঙ্গে যুক্ত উপভোক্তাকে কিষান ক্রেডিট কার্ড পাবার জন্য নিকটবর্তী ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করতে হবে।

কে অথবা কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারে:-

ব্যক্তি স্তরের প্রাণীপালক, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, FPO / FPC, JLG মিল্ক কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ইত্যাদি।

প্রকল্পের যোগ্যতামান কেমন হবে-

প্রাণীপালক, গোষ্ঠী, FPC-র সদস্য অথবা JLG -র সদস্যদের প্রাণীপালনে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং বর্তমানে নিজস্ব প্রাণী সম্পদের মাধ্যমে প্রাণীজাত দ্রব্যের ব্যবসায় লিপ্ত থাকতে হবে।

মূলধনের প্রকৃতি কেমন হবে- এই প্রকল্পের আওতায় কোন স্থায়ী মূলধন এর ব্যবস্থা থাকবে না। ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে শুধুমাত্র কার্যকরী মূলধন (আগামী এক বছরের জন্য) পাওয়া যাবে।

ঋণ বাবদ কার্যকরী মূলধন কোথায় পাওয়া যাবে:-

যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত অথবা সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে এই ঋণ পাওয়া যাবে।

ঋণের সুদের হার কেমন হবে:- বার্ষিক সাত (৭%) শতাংশ

সুদ এই প্রকল্পে উপভোক্তাকে পরিশোধ করতে হবে।

ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল কতদিন:- ঋণ পরিশোধের

মেয়াদকাল ১ বছর / ১২ মাস।

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণ পরিশোধ করলে কী সুবিধা পাওয়া যাবে:- নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ১ বৎসরের মধ্যে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করলে তিন (৩%) শতাংশ সুদের টাকা উপভোক্তা ফেরৎ পাবেন।

আবেদনের পদ্ধতি কেমন:- সরাসরি প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে ব্যাঙ্কে আবেদন পাঠাতে হবে।

এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে হলে কি জমি থাকা প্রয়োজন- জমি থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

ঋণ পেতে হলে কি কোন মর্টগেজ বা গ্যারান্টার প্রয়োজন- ঋণের পরিমানের একটি সীমা পর্যন্ত কোন মর্টগেজ অথবা গ্যারান্টার প্রয়োজন নেই।

সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করলে কি পুনরায় ঋণের জন্য আবেদন করা যাবে- হ্যাঁ, যাবে।

ঋণের আবেদন করার সময়ে যদি আবেদনকারীর কোন গবাদি পশু বা পোল্ট্রি না থাকে, তাহলে কি ঋণ পাওয়া যাবে-না, পাওয়া যাবে না।

ঋণ পেতে হলে কি বীমা করানো প্রয়োজন- বীমা দুই রকমের হতে পারে, প্রথমটি হল সাধারণ বীমা বা জেনারেল ইনসিওরেন্স এবং অপরটি হল প্রাণীর জীবনের ওপর বীমা। বীমা থাকলে ঋণ গ্রহীতার

সুবিধা, কারণ কোন কারণে ক্ষয়ক্ষতি হলে বীমা থেকে ক্ষতিপূরণের সুযোগ থেকে যায়।

কোন ঋণ গ্রহীতা যদি ঋণ খেলাপী হন অথবা এক বৎসর সময়কালের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করেন, তাহলে কি এই প্রকল্পের আওতায় থাকা বিশেষ আর্থিক সুবিধাগুলি পাবেন-না, পাবেন না।

কী কী প্রাণীপালন প্রকল্পে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যেতে পারে-

উন্নতমানের সংকর জাতের বা দেশীয় দুগ্ধবতী গাভী পালন প্রকল্প।

উন্নতমানের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন প্রকল্প (প্রজনন খামার)।

উন্নত মানের ব্রয়লার পোল্ট্রি মুরগী পালন প্রকল্প।

উন্নতমানের শূকর পালন প্রকল্প (প্রজনন খামার)।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন সমষ্টি প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক

৩. প্রাণীজ শিল্প সম্বন্ধিত পরিকাঠামো গঠনের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগ সুবিধা (A.H.I.D.F.)

এই প্রকল্পে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে প্রাণীজ শিল্প সম্পর্কিত পরিকাঠামো গঠনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

পরিকাঠামো গঠন করা যেতে পারে-

(ক) গাভী পালনের জন্য খামার তৈরীর পরিকাঠামো।

(খ) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো।

(গ) গুদাম ঘরসহ প্রাণীখাদ্য তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো।

(ঘ) সাইলেজ, ফডার ব্লক, মিনারেল ব্লক উৎপাদন করার কারখানা।

(ঙ) মাংস প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠন ইত্যাদি

কারা এই প্রকল্পের অধীনে সুবিধা পেতে পারেন-

(ক) ব্যক্তিগত উদ্যোগী

(খ) FPO/FPC/MSME/ বেসরকারী ক্ষেত্র / প্রাণীজ শিল্প সংক্রান্ত ব্যবসা, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি।

ঋণ পাওয়ার জন্য আবেদন করার পদ্ধতি-

ahidf.udyamimitra.in পোর্টালে আবেদন করতে হবে।

SIA অর্থাৎ রাজ্যস্তরের রূপায়ণকারী সংস্থা-র মাধ্যমে যোগ্য আবেদন ব্যাঙ্কের কাছে যাবে।

এরপর নিয়ম অনুযায়ী অনলাইনে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে আবার ব্যাঙ্কের কাছে আসবে এবং ব্যাঙ্ক প্রথম কিস্তির ঋণ প্রদাণ করবে।

কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে দুটি পর্যায়ে অনুদানের টাকা পাওয়া যাবে। প্রথম কিস্তির ঋণের উপরে কাজ সম্পন্ন হলে প্রথম পর্যায়ের অনুদান পাওয়া যাবে এবং দ্বিতীয় কিস্তির ঋণের উপরে কাজ সম্পন্ন হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুদানের টাকা পাওয়া যাবে।

এই ঋণের বৈশিষ্ট কী-

প্রচলিত সুদের হারের থেকে ৩ শতাংশ সুদ ছাড় পাওয়া যাবে।

সর্বাধিক ১০ (দশ) বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সময় থাকবে।

ঋণের ২৫% এ NABARD গ্যারান্টার থাকবে।

মোট প্রকল্প খরচের ৭৫-৯০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে পারেন।

সর্বোচ্চ ঋণের কোন সীমা নেই।

এই ঋণের সুবিধাগুলি কি কি-

অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রাণীপালকদের সংগঠিত ভাবে একই পদ্ধতিগত পরিকাঠামোর মধ্যে আনা যেতে পারে।

উন্নততর পরিকাঠামোর ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য সংযোজন হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সামগ্রিক ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অধিক উপার্জন ও লাভের সুযোগ পাবে।

৪. এন্টারপ্রেণিয়রশীপ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন: (Entreprenirship Development and Employment Generation)

ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশনের (NLM) আওতায়ভুক্ত এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভর্তুকিসহ (জেনারেল) ব্যাঙ্কের মাধ্যমে (রাষ্ট্রায়ত বা কো-অপারেটিভ) উপভোক্তা ১০ টি স্ত্রী ভেড়া ও ১টি পুং ভেড়া পালনের একটি ইউনিট স্থাপনের জন্য ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা বা লোন পেতে পারেন। একজন উপভোক্তা প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বাধিক এইরূপ চারটি ইউনিট স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তার আবেদন করতে পারেন। প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতীয় ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (NABARD) এই প্রকল্পটি সারাদেশব্যাপী রূপায়ন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে (SHG) প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ থেকে প্রকল্পের কারিগরীদিকের অনুমোদন (Vetting) নিয়ে নিকটবর্তী ব্যাঙ্কে আবেদন করতে হয়। ভেড়া পালনের বৃহদ আকারের (১০০ টি স্ত্রী ভেড়া ও ৫টি পুং ভেড়া) ফার্ম স্থাপন করতে চাইলেও উপভোক্তা এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। উভয়ক্ষেত্রেই মোট প্রকল্প ব্যায়ের ১০ % অর্থ উপভোক্তাকে বিনিয়োগ করতে হবে।

৫. স্বামী বিবেকানন্দ স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (SVSKP)

স্বনিযুক্তির মাধ্যমে কর্মস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত পঃ বঃ সরাকেরর এই প্রকল্পের মাধ্যমে (বিশেষত পিছিয়েপড়া মাইনোরিটি এবং মহিলারা) আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন।

মোট প্রকল্প মূল্যের ৩০% পর্যন্ত সরকারী ভতুর্কী। (ব্যাক্তিগত ক্ষেত্রে (আত্মমর্যাদা নামে) সর্বাধিক ১.৫ লক্ষ টাকা এবং গোষ্ঠীবদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মসম্মান নামে সর্বাধিক ৩.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) পাওয়া

যায়। পঃ বঃ স্বরোজগার করপোরেশনের (Unemloyed) মাধ্যমে এই সুবিধা পাওয়া যায়।

ভেড়া পালনকারীরা এই প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা বিডিও অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

৬. ছাগল ও ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণীপালকদের জীবনযাত্রার মানউন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ প্রতিবছর প্রতিটি জেলায় কয়েকহাজার নির্বাচিত প্রাণীপালক কে উন্নতমানের প্রজননক্ষম ছাগ ও ভেড়া (১ ইউনিট/ উপভোক্তা ৪ টি স্ত্রী ছাগ / ভেড়া ১ টি পুং ছাগ / ভেড়া) বিনামূল্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। তাছাড়াও ছাগ ভেড়া পালনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ, কিছু পরিমান দানা খাবার (ম্যাস), ছাগ ভেড়ার কৃমিনাষক ঔষধ এবং টীকাকরনের ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা হয়।

প্রকল্পটির সুবিধা পেতে হলে ভেড়া পালনে ইচ্ছুক উপভোক্তাগণ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি অথবা বিএলডিও অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

৭. প্রধামন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMMY)

বেকার যুবক/যুবতী ভেড়া পালনের মাধ্যমে স্বনিযুক্ত হতে চাইলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। সাহায্যের পরিমান ৫০,০০০ হাজার টাকা থেকে ধাপে ধাপে ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। তবে এই প্রকল্পে কোন ভরতুকী নেই। রাষ্টায়ত বা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হয়।

বর্তমানে রিজাভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী যে কোন সরকারী আর্থিক সাহায্যকারী প্রকল্পে লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে ১.৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোন কোল্যাটারাল সিকিউরিটি লাগে না।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব প্রকল্প। অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত কর্মীবৃন্দ বাঁ স্ব-নির্ভর কোন ব্যক্তি বিশেষতঃ ৪৬ ধরনের ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্র এবং ১৫ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত মহিলা পুরুষ এই যোজনার আওতায় আসতে পারেন।

যোগ্যতা-

১৮-৬০ বছর বয়সের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা

নির্মাণ কর্মী ও পরিবহন কর্মী বাদে বাকিদের মাসিক আয় ৬৫০০ টাকার কম্ তাদের 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' দেওয়া হয়।

যোগাযোগ - ব্লক / পৌরসভা / কর্পোরেশন-এ আবেদন পত্র জমা দিতে হয়।

সুযোগ -

১) প্রভিডেন্ট ফান্ড:- ৬০ বছর বয়সের জমাকৃত রাশি সুদ সহ এক লপ্তে পাওয়া যায়। এর জন্য রাজ্য সরকার একটি অংশ টাকা প্রতিমাসে জমা করে।

২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ:- সরকারের একই ধরনের অন্য স্কীমে যুক্ত থাকলে এই সুবিধা পাবেন না।

বর্হিবিভাগ বা হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে বাৎসরিক ২০,০০০ টাকার সাহায্য (WBHS, 2008 অনুযায়ী)

➡ রোগ পরীক্ষা ➡ ওষুধ পত্র ➡ হাসপাতালের খরচ ➡ কাজের ক্ষতিপূরণ বাবদ

শল্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাৎসরিক ৬০০০০ টাকা।

৩) মৃত্যু ও অক্ষমতাঃ- রোগ বা অ্যাক্সিডেন্ট-র কারনে পরিবারের আয় বিঘ্নিত হয়। পরিবারের সামাজিক সহায়তার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে।

অ্যাক্সিডেন্ট এ মারা গেলে ২ লক্ষ

সাধারণ মৃত্যু বা ৪০ শতাংশ অক্ষম হলে ৫০,০০০ সম্পূর্ণভাবে অক্ষম (দুটি চো ে খ / হাত ও পা / এক চোখের

দৃষ্টি শক্তি / হাতা-পায়ের অব্যবহার - ২ লক্ষ

একটি চোখ / হাত বা পা নষ্ট হলে ১ লক্ষ

৪) শিক্ষা :- এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনা-র জন্য সহায়তা।

রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের নিজস্ব বা সরকার পোষিত শিক্ষাক্ষেত্রে পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যকোন ভাবে গ্যান্ট পেলে এক্ষেত্রে বিবেচিত হবে না। এই সহায়তা পড়ার শ্রেণী বা ক্ষেত্র অনুযায়ী বাৎসরীক ৪০০০ থেকে ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়।

এই প্রকল্পে আবেদনকারীকে মাসে ২৫ টাকা দিতে হয় এবং রাজ্য সরকার ৩০ টাকা দিতেন। বর্তমানে আবেদনকারীকে কোন টাকা দিতে হয় না। সম্পূর্ণ টাকাটাই রাজ্যসরকার প্রদান করে। তাই এর নাম বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা (SSY)

পরিবারের মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য মূলতঃ উচ্চশিক্ষা বা বিবাহের সময় আর্থিক সম্ভরতা

- মেয়ের জন্য সঞ্চয় করতে পারবেন বাবা / মা

বয়স - জন্মের সময় থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত

সুযোগ - ২১ বছর বয়স বা বিবাহ - যেটা আগে

অর্থরাশি - বাৎসরিক নূন্যতম ২৫০ টাকা এবং সর্বাধিক ১.৫ লক্ষ টাকা

সময় - প্রতি বছর

বিশেষ ব্যবস্থা - ১৮ বছর বয়সে জমাকৃত রাশির একটি অংশ প্রয়োজনে তোলা যায়। বর্তমানে এর সুদের হার ৭.৬%

প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনা (PMJJBY)

১। এটি এক ধরনের জীবন বীমা।

২। যুক্ত হওয়ার বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছর।

৩। যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিসে সঞ্চয় খাতা থাকতে হবে।

৪। বার্ষিক প্রদত্ত টাকা ৪৩৬ টাকা (১লা জুন থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত)

৫। প্রথমবার যুক্ত হওয়ার জন্য মে মাসে ব্যাঙ্কে/পোষ্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (PMSBY)

১। এটি এক ধরনের দুর্ঘটনাজনিত বীমা।

২। যুক্ত হওয়ার বয়স ১৮ থেকে ৭০ বছর।

৩। যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিসে সঞ্চয় খাতা থাকতে হবে।

৪। বার্ষিক প্রদত্ত টাকা- ২০ টাকা (১লা জুন থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত)

৫। প্রথমবার যুক্ত হওয়ার জন্য মে মাসে ব্যাঙ্কে/পোষ্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

References

Ahlawat, S. P. S., Tantia, M. S., Sahana, G. (2022). Conservation and development of Garole sheep in Sundarban areas of Eastern region. Proc. Nat. Symp. Prospect of Animal Resources in Eastern and North Eastern Region of India. IVRI, Belgachia, Kolkata, pp. 36-39.

Anon (2010). Control of external parasites of sheep and goats. USAID. Technical Bulletin No. 41, p. 1-13.

Arora, R., Bhatia, S., Sodhi, M., Sahana, G., Mukesh, M. and Ahlawat, S. P. S. (2005). The prolific micro sheep of India: Garole. Monograph, 18, NBAGR, ICAR, p. 1-18.

Banerjee, R. (2008). Conservation and in situ development of a prolific indigenous sheep in the Sundarbans and Sagar Island. Ph.D. thesis, University of Calcutta, Kolkata, West Bengal, India.

Banerjee, R., Mandal, P. K., Pal, U. K., Ray, K. (2010). Productivity and genetic potential of Garole sheep of India – A review. Asian Journal of Animal Sciences, 4(4):170-189.

Banerjee, R., Mandal, P.K., Bose, S., Banerjee, M. and Manna, B. (2009). Quality evaluation of meat, skin and wool from Garole sheep – a promising breed of India. Asian Journal of Animal Sciences, 3(2):39-46.

Banerjee, R., Mandal, P.K., Pal, U.K. & Ray, K. (2010). Productivity and genetic potential of Garole sheep of India – A review. Asian Journal of Animal Sciences, 4:170-189.

Banerjee, S. (2003). Studies on some economic traits of Garole sheep of West Bengal. Ph.D. thesis, Department of Animal Sciences, BCKV, West Bengal, India.

Banerjee, S. (2016). Body indices of Garole sheep reared in West Bengal (India). Proc. Zool. Soc., DOI: 10.007/s12595-015-0162-7.

Banerjee, S. and Banerjee, S. (2000). Garole sheep of Bengal. Asian Livestock Food and Agricultural Organization, Rome/Bangkok, 24(3):19-21.

Banerjee, S., Galloway, S. M. and Davis, G. H. (2011). Distribution of prolific Garole sheep in West Bengal, India. Animal Genetic Resources/Resources genetiques animals/Resursos geneticos animals, 48:29-35.

Bhateshwar, V., Rai, D. C., Datta, M. and Aparnna, V. P. (2022). Current status of sheep farming in India. J. Livestock Sci., 13: 135-151.

Bhatia, S. and Arora, R. (2005). Biodiversity and conservation of Indian sheep genetic resources – an overview. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 18(10):1387-1402.

Bose, S. (1996). Studies on the productive and reproductive performance of sheep in the saline and semi saline belt of West Bengal. Ph. D. thesis, West Bengal, University of Animal and Fishery Sciences, Kolkata, West Bengal, India.

Bose, S. and Moitra, D. N. (1995). Bengal breed of sheep in the Sundarbans. Asian Livestock, 20:16-17.

Bose, S., Duttagupta, R. and Maitra, D. N. (1999). Phenotypic characteristics and management practices of Bengal sheep. Indian J. Animal Production and Management, 15(1):18-22.

Das, D. (2000). Phenotypic, genotypic performance of Garole sheep. MVSC thesis, West Bengal, University of Animal and Fishery Sciences, Kolkata, India.

Das, D. (2000). Phenotypic, genotypic performance of Garole sheep, Ph.D. Thesis, West Bengal, Univ. Anim. & Fish. Sciences, Kolkata, West Bengal, India.

Dastagiri, M. B., Nageswara Rao, A. and Krishna, N. (1988). An economic study of sheep rearing in Chittoor district of Andhra Pradesh. Agricultural Situation in India, 43:213-216.

Davis, G. H. et al. (2002). DNA tests in prolific sheep from eight countries provide new evidence on origin of the Booroola (FecB) mutation. Biology of Reproduction, 66:1869-1874.

Dhara, K. C., Banerjee, D., Dasgupta (Das), P., Dutta, A., Ghosh, S. (?).DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.114159.

Ghalasasi, P. et al. (2009). Pure Garole rams have superior worm resistance compared to crosses comprising Deccani, Bannur, Garole and Awassi breeds in Phaltan, Maharashtra. Proc. XIX Nat. Conger. Vet. Parasito. And Nat. Symp. On "Nat. impact of parasitic diseases on Livestock health & production." Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences. University of Ludhiana, Punjab, India, 3-5 February, 2009, p-31.

Ghalasasi, P.M. and Nimbkar, B.V. (1993). The "Garole" microsheep of Bengal, India. Animal Genetic Resources Information, 12:73-79.

Ghalsasi, P. M. and Nimbkar, B. V. (1993). The Garole-microsheep of Bengal, India. Animal Genetic Resources Information, 12:73-79.

Ghosh, S., Goswami, A. and Biswas, S. (2023). Study on socio personal characteristics and adaptation status of Garole sheep farmers in Sundarban area of the state West Bengal, India. The Pharma Innovation Journal, sp-12(10):448-451.

Ghosh, S., Goswami, A. and Biswas, S. (2023). Study on socio-personal characteristics and adoption states of Garole sheep farmers in Sundarban area of the state West Bengal, India. The Pharma Innovation Journal, SP-12(10):448-451.

Government of India (2014). 19th Livestock Census-2012, All India Report, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry. Dairying and Fisheries, Krishna Bhavan, New Delhi, p.120.

Hassan, M.R. and Talukder, M.A.I. (2011). Comparative performance of different regional native sheep of Bangladesh. The Bangladesh Veterinarian, 28(2):85-94.

Hossain, et al. (2018). Socio-economic status of sheep farmers and the management practices of sheep at Gafargaon upazila of Mymensingh district. Int. J. Nat. Social Sciences, 5(4):07-15.

Hossain, et al. (2021). Socio-economic characteristics and present scenario of sheep farmers at Sherpur district in Bangladesh. SAARCJ. Agric, 19(1):185-199.

Kadam, V. et al. (2021). Sheep wool and Mutton: Production and value addition, ICAR-CSWRI, Avikanagar and Manage, Hyderabad, p. 1-133.

Karmakar, P. K. et al. (2018). Genetic parameters for direct and maternal effects on birth weight of Garole sheep. Indian Journal of Small Ruminants, 24(2):225-229.

Kaufman and Rutz (2010). Pest management recommendation for sheep, goats and Swine. PennState , USA,P.1-12.

Kumar, et al. (2015b). Clinico-pathological studies of gastrointestinal tract disorders in sheep with parasitic infection. Vet. World, 8(1):29-32.

Kusiluka, L.J.M. & Kambarage, D. M. (1996). Diseases of small ruminants in Sub-Saharan Africa: A Handbook. VETAID, P. 1-116.

Mandal, A. et al. (2017). Prolific Garole Sheep: Pride of Bengal. Research and Review, Journal of Dairy Science and Technology, 6(2):11-19.

Mondal, K., Chatterjee, J. K., Das, A., Roy, M. and Patra, G. (2023). A study on productive performance of Garole sheep in Sundarban areas of West Bengal. *Indian J. Animal Health*, 62(2): 328-329.

Nimbkar, C. et al. (2003). Expression of the FecB gene in Garole and crossbred ewes in Maharashtra, India. Proceedings of the Association for the Advancement of Animal Breeding and Genetics, 15:111-114.

Nimbkar, C., Ghalsasi, P. M., Ghatge, R. R., Gray, G.D. (1998). Establishment of prolific Garole sheep from West Bengal in the semi-arid deccan plateau of Maharashtra, Proc. 6th World Cong. Genet. Applied Livestock Prod. Armidale, 25:257-260.

Palanichamy, V. (2005). Economic analysis of sheep production in dryland farming system of southern Tamil Nadu. Ph.D. Thesis, Veterinary and Animal Sciences University, Chennai.

Pan, S. and Sahoo, A. K. (2003). Garole sheep. Report of Ad-Hoc Research scheme on survey evaluation of Garole sheep in Sundarban area of West Bengal. West Bengal Univ. Agri. and Fisheries Sciences, Mohanpur, West Bengal, India.

Pan, S. and Sahoo, A. K. (2009). The Garole sheep: History, management, production and current status. In: Use of the FecB (Booroola) gene in sheep breeding programs. Proceedings of the Helen Newton Turner Memorial International Workshop, S.W. Australia Centre for Int. Agri. Research Australia, November, 10-12, 2009, Maharashtra, India, pp. 32-43.

Pan, S. et al. (2004). Garole sheep. NATP (MM). Project on Animal Genetic Resources Biodiversity. WBUAFS, Mohanpur, West Bengal.

Peksa, A.D. and Mitchell, S. (2018). Important ectoparasites of sheep and cattle, cattle farm animal parasites sheep. p. 1-4.

Pezzanite, L. (?). Common diseases and health problems in sheep and goats. Animal Sciences, PURDUE, University Extension. P.1-12.

Prabaharan, R. and Sivaselvam, S. N. (1987). A study on economics of sheep rearing in the southern districts of Tamil Nadu. Department of Animal Husbandry Economics Research Report, 13. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

Prabu, M., Selvakumar, K. N., Pandian, A. S. S., and Meganathan, N. (2009). Economic analysis of sheep farming in Tamil Nadu. Indian Journal of Small Ruminants, 15(2):224-230.

Prasad, J. (1997). Goat, sheep and pig production and management. Kalyani publishers, New Delhi.

Prasanthi, et al. (1999). Biochemical observations in ovine strongylosis. Indian Vet J., 76(10): 892-894.

Prathibha, K.R., Chetan, K. and Yogish, S. N. (2021). Economic analysis of sheep farming in India. UIJRT, 2(7):18-21.

Rath, N. (1992). Economics of sheep and goat production in Maharashtra, India. J. Ag. Econ., 47(1):62-78.

Roy et al. (2018). Studies of inheritance of resistance to *Haemonchus contortus* through diallel mating in Garole sheep. Journal Ento. Zool. Stud., 6(1):569-573.

Roy, I. et al. (2023). Garole – A promising sheep breed in Coastal West Bengal. J. Indian Soc. Coastal Agric. Res., 41(1):64-70.

Sagar, R. L. and Biswas, A. (2008). Constraints in Garole sheep rearing in Sundarbans: Farmer's perception. The Indian Journal of Snail Ruminants, 14(1):89-92.

Sahana, G. et al. (2001). Garole: The prolific sheep of India. Animal Genetic Resources Information, 31: 55-63.

Sahana, G., Gupta, S.C., Nivsarkar, A.E. (2001). Garole: The prolific sheep of India. Animal Genetic Resource Information, FAO, Rome, 31:55-63.

Sanyal, P. K. (1996). Gastrointestinal parasites and small ruminant production in India. In Sustainable Parasite Control in small Ruminants (ed. L. F. Le Jambre and M. R. Knor), pp. 109-112. ACIAR Proceedings No. 74. ACIAR, Canberra, Australia.

Sen, A.R., Karim, S. A. (2010). Carcass and meat quality characteristics of designated indigenous sheep breeds of India. Indian Journal of Animal Sciences, 80(4):362-365.

Sharma, R. S. et al. (1999). Characteristics of Garole sheep in India. Animal Genetic Resources Information, 26:57-64.

Shridhan, VM. et. al. (2022). Sheep production practices in North Karnataka. The Pharmaceutical Innovation Journal. SP-11(4):838-840.

Singh, R. N. and Bohra, S.D.J. (1996). Garole sheep a prolific. Indian Journal of Small Ruminants, 2:38-42.

Tiwari et al. (2017). Haemato-Biochemical alteration in gastrointestinal disorders of sheep with parasitic infection. Indian J. Anim. Health, 56(2):233-238.

Walkden-Brown, S. and Nimbkar, C. (2010). Improved productivity, profitability and sustainability of sheep production in Maharashtra, India through genetically enhanced prolificacy, growth and parasite resistance. ACIAR, Australia, 55pp.

Yadav, A.K. and Singh, J. (2016). Registered indigenous sheep breeds of India: An overview. Indian Farmer, 3(2):086-103.

Yadav, D. K., Arora, R., Bhatia, S., and Singh, G. (2011). Morphological characterization, production and reproduction status of Munjal – A threatened sheep population of North-West India. Indian J. Anim. Sciences, 81(9):943-945.

Yadav, D. K., Jain, A., Kulkarni, V. S. et al. (2013). Classification of four ovine breeds of Southern Peninsular Zone of India: Morphometric study using classical discriminant function analysis. Springer Plus 2: 29-37.